ত্রৈমাসিক

ইসলামী আইন ও বিচার

ঃ ৪ । সংখ্যা ঃ ১৪ । এপ্রিল-জুন ২০০৮

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ইসলামী আইন ও বিচার
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১৪

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে এডভোকেট ***মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম***

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০০৮

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
সুট-১৩/বি, ফ্লোর-১২, নোয়াখালী টাওয়ার
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬, ০১৭১১ ৩৪৫০৪২
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate ***MUHAMMAD NAZRUL ISLAM*** *General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. Suite-13/B, Floor-12, Noakhali Tower, 55/B Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

একুশ শতকের বিশ্বে ইসলামের নতুন শক্তি ও সম্ভাবনা

একুশ শতক ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এ পর্যন্ত চৌদ্দটি শতক অতিক্রম করে এসেছে। চৌদ্দশ' বছর পরে কোনো ধর্ম আর ধর্ম থাকে না, হয়ে ওঠে এক ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ও নিষ্প্রাণ সামাজিক রীতি। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর পরও ইসলাম কেবল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার মূল প্রাণশক্তিও বজায় রয়েছে। তার মূল কিতাব এবং মূল চিন্তাধারা হাদীস অবিকৃত রয়ে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, ইসলাম কেবল একটি ধর্মমাত্র নয়, একটি জীবন বিধানও। আর জীবন বিধান হবার কারণে বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের সাথে তাকে সবসময় সম্পর্কিত থাকতে হয়েছে এবং এ পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে সে অবিকৃত রেখে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অন্যান্য ধর্ম মূলত আসমানি কিতাব ভিত্তিক ধর্মগুলো সবই ছিল ইসলাম এবং ইসলামের মৌল বাণী ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে সেগুলো নিজেকে অবিকৃত রাখতে পারেনি।

ইসলাম কিভাবে নিজেকে অবিকৃত রেখেছে? প্রথমত ইসলামের মূল কিতাব কুরআনকে আল্লাহ নিজেই অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন 'অবশ্য আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হিফাজতকারী (সূরা আল হিজর : ৯)। আরো বলা হয়েছে : ছুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানাহ। অর্থাৎ 'এরপর এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই (আল কিয়ামাহ : ১৯)। একটি কিতাবের মূল বাণী যদি সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার বিশেষ ধারা নির্ধারিত হয়ে যায়, তারপর তার বিকৃতির আর কোনো পথই থাকে না।

এখন ইসলামের মূল চিন্তাধারা অর্থাৎ কুরআনের অবিকৃত থাকার তাৎপর্য কি? চিন্তাধারার যুগে যুগে পরিবর্তনই স্বাভাবিক। যুগের পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মানুষের জীবনে ও জীবন যাপনে পরিবর্তন তো অতি সাধারণ ব্যাপার। অনড় ও কঠোর নিয়মে বাঁধা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনকে সামাল দিতে গিয়ে জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও সফলকাম করে তুলতে নতুন নতুন চিন্তার প্রয়োজন হয়। মূলত নতুন নতুন চিন্তার কারণে মানুষের সভ্যতা দুনিয়ায় অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছে। যুগের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে যদি মানুষের চিন্তার পরিবর্তন না হতো তাহলে মানুষ স্থবিরতা ও জড়ত্বে পৌঁছে যেতো।

এ ক্ষেত্রে এ অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয় কুরআন মানুষের পরিবর্তনশীল জীবন ও সভ্যতার পথের দিশারী হতে পারে কেমন করে? কেবল আজকের আধুনিক যুগে নয়, বিশেষ করে বিগত কয়েকশ বছর থেকে, যখন থেকে ইসলাম বিশ্ব সভ্যতায় তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারিয়েছে বিশ্বের একদল জ্ঞানী-গুণী একথা বুঝতে একেবারেই অক্ষম হয়েছেন। আসলে তারা মানুষের জীবনকে দেখেন দুনিয়ার সীমিত গণ্ডীর ভেতরে। এর মধ্যে কিছুকালীন জীবনে তার বেঁচে থাকা এবং দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করার ক্ষমতা অর্জন করাটাই তাদের কাছে মুখ্য। শুধু তার নিজের বাঁচার জন্য যদি অন্যকে মারার প্রয়োজন হয় এবং অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে অপহরণ করতে হয় তাহলে তাকেও তারা

সাফল্যের মধ্যে গণ্য করেন। মানুষ এমন একটা জীবন যাপন করতে পারে যে জীবনের প্রতি পদে পদে সে নিজের কাঁধে একটি অর্পিত দায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করে, মানুষ কেন কোনো প্রাণীর প্রতিই কোনো প্রকার অন্যায়, জুলুম, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও অন্য কোনো ধরনের অসৎবৃত্তি অবলম্বন করার কথাই সে চিন্তা করতে পারে না এবং সমস্ত জীবন সে অতিবাহিত করে আর একটি জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, যা অনন্তকালীন এবং যা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, একথা তারা কল্পনাই করতে পারেন না। দুনিয়ার পরিবর্তনশীলতাকে তারা এমন দৃষ্টিতে দেখেন যেন এটিই বিশ্ব প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং একে যে কোনোভাবে অতিক্রম করতে পারলেই জীবন সফল ও সার্থক।
অথচ জীবনের এখানেই শেষ নয়। মৃত্যু শেষ যতি চিহ্ন নয়, পরবর্তী আসল ও অনন্ত জীবনের দ্বারদেশ মাত্র। পৃথিবীতে যতোগুলো পরিবর্তন ঘটে, তা ঘটে নিছক জীবনের কারণে। পার্থিব জীবনটাই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে নিজে নিজেই সচল। তার মধ্যে যে গতি সঞ্চার করা হয়েছে এই গতিটাই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। মানুষের জীবনে নিত্যনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য তার শারীরিক কাঠামোর এক একটি গতি। এ গতির পরিবর্তন তাকে এগিয়ে দিচ্ছে অনন্তকালীন স্থায়িত্বের দিকে। সেখানে জীবন আছে সবকিছুই আছে কিন্তু শেষ বা মৃত্যু নেই। সেখানে সবকিছুই প্রকৃতিগতভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয়। এ স্বল্প ও খণ্ডকালীন পৃথিবী সেই অনন্ত কালীন মহাজগতের সাথে সম্পর্কহীন নয়। বরং তারই উদ্দেশ্যে একে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এ জগতে এমন চিন্তা মানুষের জন্য লাভজনক যা অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় অনন্তকালীন চিন্তার সাথে একসূত্রে গাঁথা। তাই যে অনন্তকালীন প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে এ পবিরর্তনশীল বিশ্বে মানুষকে কিছুকালের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সেই প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী সঠিক কাজ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে এ অপরিবর্তনীয় চিন্তার অনুসারী। তাই ইসলামকে প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের চিন্তা ও জীবন বিধানকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা মানুষের এ স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।
তাই কুরআনী চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন নেই কিন্তু পরিবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। এ স্থায়ী চিন্তা কখনও স্থবিরত্বের শিকার হয় না। মানুষের জীবনে, সমাজে ও এই বিশ্ব প্রকৃতিতে যতো রকম পরিবর্তন আসতে পারে তার সমগ্র মৌল কাঠামোর ভিত্তিতে এর সামগ্রিক চিন্তাধারাকে গ্রথিত করা হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, যিনি এ চিন্তাধারার উদগাতা তিনিই এ জীবন, সমাজ, প্রকৃতি ও সকল প্রকার পরিবর্তনশীলতার স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্তা। তিনি ভবিষ্যত বর্তমান ও অতীতের কেবল পূর্ণ জ্ঞান রাখেন তাই নয়, বরং এর স্রষ্টাও।
তাই কুরআনের অপরিবর্তনীয় চিন্তা মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা নয়। বরং তার সমৃদ্ধ অতীতের ভিত্তিতে তার বর্তমানকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত রাখা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। বিশ্ব ইতিহাসের বিগত চৌদ্দশ বছর এরই একটি খোলা চিত্র পেশ করেছে।
ঈসায়ী সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতকে কুরআনী চিন্তা যখন পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও তার মৌল প্রাণসত্তা সহকারে বিশ্ব শাসন করে তখন মানুষের জীবনে যে শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার আসে তা আজও মানবেতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুসলমানরা তখন বহু দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে কিন্তু সে যুদ্ধ পরবর্তীতে ধ্বংস ডেকে আনেনি বরং মানুষ শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও শান্তির পসরা লাভ করেছে। সভ্যতা অগ্রগতি লাভ করেছে। গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে মানুষের অগ্রগতির উপাদান পর্যবেক্ষণ করে

মুসলমানরা আন্তরিকতার সাথে তাকে নবজীবন দান করেছে। পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল ধরে যা সমালোচিত, নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে, মুসলমানরা তার সত্যতা উপলব্ধি করার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে একটুও দ্বিধা করেনি। মুসলমানরা যে সভ্যতার ভিত গড়েছে, তার মধ্যে ধ্বংসের নয়, সমৃদ্ধির সমস্ত উপাদান সংরক্ষিত হয়েছে।

তারপর থেকে নিয়ে পনের শতক পর্যন্ত মুসলমানরা যে বিশ্ব শাসন করেছে তার মধ্যে কুরআনী চিন্তা থেকে বিচ্যুতির গতি দ্রুততর হয়েছে। তাই সেক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার মধ্যে জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা জাহেলিয়াতের কাছে পরাস্ত হয়েছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতক আসতে আসতে এ পরাজয় একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এ সময় মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোও জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের পদানত হয় এবং তারা সেখানে তাদের জাহেলী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। মুসলিম মিল্লাতের বৃহদাংশ কুরআনী চিন্তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। জাহেলী চিন্তার আপাত ঔজ্জ্বল্যে তাদের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই। তার অন্ধকার গর্ভে আলোর দিশা নেই : 'যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে, তাগুত তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় (আল বাকারাহ : ২৫৭)।

কিন্তু বিশ শতকে এসে মুসলমানরা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে সক্ষম হচ্ছে। তারা কুরআনের শিক্ষাকে আবার নতুন করে গ্রহণ করতে শিখছে। পাশ্চাত্যবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। পুরাতন ছাই ভস্মের মধ্যে যে আগুন চাপা ছিল তা ফেটে বের হওয়া শুরু হয়েছে। ইসলামের আলো মুসলমানদের অন্তরকে আলোকিত করছে। সারা বিশ্বে ইসলামের একটা প্রাণ স্পন্দন দেখা দিয়েছে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ট যে কোনো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়, তা সে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যে কোনো মহাদেশেই হোক না কেন এখন এটা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। মুসলমানরা ইসলামের মূল বিধান, মূল অনুশাসন ও মূল চিন্তার দিকে ফিরে যেতে চায়। মুসলমানরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা লাভের প্রচেষ্টা বেড়েছে। ইসলামের দুটি মূল উৎস কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীসের চর্চা ব্যাপক হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা বলেছি, আল্লাহ কুরআনের ব্যাখ্যা সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সহী হাদীস সংরক্ষণের মাধ্যমে তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। আজ এ সমস্ত সহী হাদীস সকল প্রকার জটিলতা মুক্ত হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি হেদায়াত গ্রহণ করা এখন মুসলমানদের জন্য মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রথম থেকেই মুসলিম উলামা ও ফকীহগণ কুরআন ও হাদীস থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি বিধান ও অনুশাসন গ্রহণ করতেন। ইসলামী পরিভাষায় একে ইজতিহাদ ও রায় বলা হয়। ফকীহ ও মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতি জ্ঞান রাখতেন। এজন্য তাঁরা কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এ সিলসিলা তিন চারশ বছর পর্যন্ত জোরেশোরে চলতে থাকে। পরবর্তীকালে এ মূলনীতি বা উসূল প্রণয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং ফকীহগণ আগের ইমামদের উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে থাকেন। এঁদেরকে বলা হয় মুজতাহিদ ফিল মযহাব। এঁরা নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ করলেও

নিজেদের ইমামদের সীমানা ও গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করেছেন। হিজরী সাত আট শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি এ সময় পর্যন্ত যথেষ্ট নজর রাখা হয় কিন্তু এরপর থেকে শুরু হয় নিছক ফতোয়া দানের যুগ। এ সময় ইজতিহাদের ধারা অতি দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকে। শেষের দিকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মুফতীগণ কেবলমাত্র নিজের মযহাবের ইমামগণের রায়ের মধ্য থেকে একজনের রায়কে প্রাধান্য দিয়েই ক্ষান্ত হন, সেই আলোকে নিজের কোনো রায় উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকেন। ফিকহের পরিভাষায় একে তাকলীদ বলা হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী শরীয়তের চৌদ্দশ বছরকে যদি ইজতিহাদী ও তাকলীদী যুগ হিসেবে দুভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে আমরা দেখবো, ইজতিহাদী যুগে পরিবর্তনকে গ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে তখন ইসলামী আইন, সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল গতিশীল। ব্যক্তির মধ্যেও ছিল গতিশীলতা, সৃজনশীলতা এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রবণতা। অন্যদিকে তাকলীদী যুগে পরিবর্তনকে অবহেলা করা হয়েছে এবং কখনো তাকে স্বীকার করাই হয়নি। আর কোথাও স্বীকার করা হলেও তার মূল্যায়নের চেষ্টা ও সাহস করা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে জীবনে এসেছে স্থবিরতা, সমাজে এসেছে কলহ ও বিরোধ এবং চিন্তায় বিভ্রান্তি।

এ অবস্থায় বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা মুসলমানদের মধ্যে হ্রাস পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনকি এক পর্যায়ে অন্য জাতির দাসবৃত্তিও তাদের কপালে জুটেছে।

বিগত কয়েক শতক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে মুসলমানদের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা হচ্ছে :

এক. তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের কার্যকারিতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

দুই. ইসলামকেও তারা অন্য ধর্মের মতো ধর্ম মনে করেছে।

তিন. ইসলামের প্রতি ঈমানকে তারা নিছক বিশ্বাসের পর্যায়ে রেখেছে। তার ওপর আমল করা ও তার বিধানগুলো মেনে চলা অপরিহার্য মনে করেনি।

বিশ শতকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলো জন্মলাভ করেছে তার ফলে মুসলমানরা ইসলামের মূল উৎসগুলোর দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। চৌদ্দশ বছরের মধ্যে অবস্থার সাথে সাথে সমস্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং তার ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবও তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। ইসলামকে তারা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।

অন্যদিকে বিশ্ব পর্যায়ে বিগত চার পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিন্তার পরিবর্তিত রূপগুলোর একের পর এক ব্যর্থতা অনৈসলামী বিশ্বকে যেমন একদিকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে ইসলামের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তুরস্ক ও আলজিরিয়ার মতো কোনো কোনো মুসলিম দেশে মুসলমানদের ইসলামী আগ্রহকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা করে সেক্যুলারিজমের অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা আর বেশিদিন হালে পানি পাচ্ছে না। মুসলিম জনতার আগ্রহ বিশেষ করে তুরস্কে সেনাবাহিনীর শক্তিকে নস্যাত করে দিতে চলেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মতো বিপুল অমুসলিম সমৃদ্ধ এলাকার ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের মধ্যে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ বেড়ে চলছে।

এভাবে আমরা দেখি বিশ্বব্যাপী ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা ও প্রবণতা

প্রতিদিন বেড়ে চলছে। এ প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা যত বাড়বে এবং কৌশল যতই সুতীক্ষ্ণ ও সতেজ হবে সাফল্য ততই স্পষ্ট হবে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। গত চৌদ্দশো বছরের ইসলামী জ্ঞান চর্চাকে নতুন করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, মাকাসিদ ও আইন চর্চার পরিসর বৃদ্ধি ও ব্যাপকতা লাভ করছে। কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র নির্মীত হচ্ছে। গত তেরশো বছরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে অর্ধশতের মতো আইনকোষের আকারে সেগুলো সংকলন করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আরবী ছাড়াও অন্যান্য বড় বড় ভাষায় সেগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হতে চলেছে। অর্থনীতিকে ঢেলে আল্লাহ ও রসূলের বিধান অনুযায়ী সাজাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সূদ একমাত্র মুসলমান সমাজেই চিরতরে হারাম। কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থার অপরিহার্য নিষ্পেষনে তারাও আকণ্ঠ সূদে ডুব দিয়েছে। মনে হচ্ছিল এই সাগরের অতলে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো গতি নেই। কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থায় অনেক বিস্ময়ের মধ্যে এটাও একটা বিস্ময় যে, বিশ্বব্যাপী সূদী ব্যবস্থার মধ্যেও সূদের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে। এ প্রচেষ্টার সাফল্য বিশ্ব ব্যবস্থারই চেহারা পাল্টে দেবে। কারণ সূদ পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ব ব্যবস্থায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে নারীর অবস্থান। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আধুনিক বিশ্বে তার অনুসারী নেতৃত্বশালী দেশগুলো নারীকে তার যথাযথ আসনে বসাতে পারেনি। আসলে নারীর ও নারীত্বের মর্যাদা উপলব্ধি করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষের মতো নারীও এক একক ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। নারীর অবস্থা ও পুরুষের অবস্থার মধ্যে সমতা বিধানের চাইতে সামঞ্জস্য বিধান করাটাই প্রয়োজনীয় ও জরুরী। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দুজনের অবস্থান একত্র এবং একজন অন্যজনের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে আসছে। একজন ছাড়া অন্যজনের অস্তিত্বই বিপন্ন। অস্তিত্বের সাথে জড়িত রয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমাজ। নারী একজন মানুষ এবং পুরুষও একজন মানুষ। দুটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর একজন মানুষ গড়ে ওঠে। তাকে একটা শিশু না বলে একটা সভ্যতা এবং একটা 'নতুন বিশ্ব' বলা যেতে পারে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এই 'নতুন বিশ্ব' গড়ে তোলার কল্পনাই করা যায় না। নারী ও পুরুষ উভয়কে সমান করে দিতে পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে উভয়কেই যদি অর্থনেতিক জীবে পরিণত করা হয়, তাহলে নারীর তথা মায়ের স্নেহ মায়া মমতা ও পরিচর্যার অভাবে একটি শিশু যথার্থ মানুষের পরিবর্তে অমানুষ রূপে গড়ে উঠবে। এটা হবে পশুত্বেরও অধম। কারণ পশুরাও তাদের সন্তানদের পশু সুলভ মায়া মমতা দিয়ে লালন পালন করে। এই অবস্থাকেই কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না, তারা পশুর মতো এবং তার চেয়েও বিভ্রান্ত, তারাই গাফেল (আল আ'রাফ : ১৭৯)। এর পরিবর্তে অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করে দিলে সমাজ ও সভ্যতার কোমল অংগনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাকে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং সংগে সংগে সমাজ ও সভ্যতাকে নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। ইসলাম এবং কুরআন এই ব্যবস্থাই দান করেছে। প্রকৃতিগতভাবে নারীর ওপর যে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব আসে অর্থাৎ সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান জন্ম দান, তার দুধপান, লালন পালন (অর্থনৈতিক নয়), পরিচর্যা এবং সাংসারিক সেবা যত্নের

অন্যান্য দায়-দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে। সাংসারিক এবং পারিবারিক অন্যান্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরুষের। স্ত্রীর, সন্তানের এবং সংসারের অন্যান্য সবার ভরণ পোষণ, সবার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, মেহমান, অনাথ, এতিম তথা যাবতীয় অভাবীদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব, স্বামীর ওপর বর্তাবে। এ সবের কোনোটার দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর বর্তাবে না। এজন্য পুরুষ ও নারীর যৌথ ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম পুরুষকে কর্তার আসনে বসিয়েছে। এরপরও স্ত্রীর তথা নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বাড়তি দায়িত্ব ইসলাম ও কুরআন গ্রহণ করেছে। তাকে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার স্বত্ব দান করেছে। কুরআন ও হাদীসে যে ১২ জনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারস্বত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জনই নারী। আর সে ৮ জন হচ্ছে– স্ত্রী, কন্যা, নাতনী, সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় বোন,মা ও দাদী-নানী।

এভাবে ইসলাম নারী ও পুরুষের অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে নারীকে যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর স্বাধীন বিচরণ ও ভূমিকা পালনে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। নারী তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী বাড়তি যে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমান করার পরিবর্তে তাদের যার যার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করেছে।

বিশ্ব ব্যবস্থায় তৃতীয় যে পরিবর্তনটা মুসলমানরা আনতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণ। দেড় দুশো বছর থেকে মুসলমানরা পাশ্চাত্য দেশগুলোর শিক্ষার অংগনে বিচরণ করছে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও পার্থিব স্বার্থান্বেষী শিক্ষা ব্যবস্থার চাপে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। দেড় দুশো বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এখন তারা ইসলামাইজেশান অব নলেজের প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এক আল্লাহে বিশ্বাস, মানবতার কল্যাণ ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভিত্তিতে তারা পশ্চিমা জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে নতুন করে সাজাবার চেষ্টা করছে। এটা হবে একটা দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা।

সাম্প্রতিক কর্ম ও প্রচেষ্টাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই তা হচ্ছে, বিগত শতকের পূর্বে গোটা উনিশ শতক ব্যাপী মুসলমানদের নির্জীবিতা ও জরাগ্রস্ততায় কোনো কমতি ছিল না। জামালুদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামিজমের আহ্বান নিয়ে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ চষে বেড়ানো, আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সনৌসি আন্দোলন এবং উপমহাদেশে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া তথা ইসলামী জিহাদ আন্দোলন মুসলমানদের জরাগ্রস্ত সত্তায় একটু ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিল মাত্র। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকেই এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে ইসলাম একটা জীবন্ত শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। ইসলামের মৃত দেহে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এটা কোনো সাময়িক ঘটনা নয়। যে বিশ্ব থেকে আল্লাহকে এবং তাঁর আইনকে নির্বাসিত করা হয়েছিল সে বিশ্বে আল্লাহর পুনরবাসন কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। ইসলামের অন্তরনিহিত শক্তিতেই এটা সম্ভব হতে চলেছে। ইসলাম বিশ্বকে গ্লানিমুক্ত করে একটা নতুন বিশ্বে রূপান্তরিত করতে চলেছে।

–আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ১১-১৭

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্নাতে রসূল স.-এর গুরুত্ব

ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

সুন্নাত আরবী শব্দ। এর অর্থ পথ, সুপরিচিত পথ, সঠিক ও সুন্দরভাবে মাড়ানো পথ, যা বার বার অনুসরণ করা হয়, বিষয়, গতিপথ, কার্যধারা, অভ্যস্ত আচরণ, নিয়ম-নীতি, চিরাচরিত প্রথা, রীতি-নীতি, ধরন-প্রকৃতি, অভ্যাস-আচরণ, শিষ্টাচার, আচরণ-ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম কানুন, জীবন পরিচালন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি[১] ইত্যাদি। শাব্দিক অর্থ থেকে যা বুঝা গেলো তা হলো সুন্নাহ হচ্ছে মানব জীবন বা সমাজ জীবন পরিচালনার পদ্ধতি। অতএব, কোন মানুষ বা রাষ্ট্র যে নিয়মে চলে সেটা হলো ঐ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সুন্নাত বা পদ্ধতি। আল্লাহ যে পদ্ধতিতে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেন এটা তাঁর সুন্নাহ। খোলাফায়ে রাশেদীন যে পদ্ধতিতে জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করেছেন এটা হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্। তেমনিভাবে মহানবী মুহাম্মদ স. যে পদ্ধতিতে তাঁর সমগ্র জিন্দেগী পরিচালনা করেছেন তাই হচ্ছে সুন্নাতে রসূল স.। অতএব আহার-বিহার, বিশ্রাম, বিনোদন যে পদ্ধতিতে করেছেন তা হলো আহার-বিহারের সুন্নাহ্। রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো রাজনীতিক। সুন্নাহ্ বিচার কার্য পরিচালনা ও অপরাধীর শাস্তি বিধানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো বিচার ও শাস্তি বিধান সংক্রান্ত সুন্নাহ্ । পবিত্র কুরআনে ১৬ বার সুন্নাহ্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্র রীতি-নীতিকেও সুন্নাহ্ বলা হয়েছে। যেমন

আল্লাহ্র সুন্নাহ্ এর মাঝে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।[২]

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'তোমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয় হচ্ছে আমার সুন্নাহ্ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।'[৩]

সুন্নাহ-এর সমার্থক সবচেয়ে বেশি পরিচিত অপর শব্দটি হলো হাদীস। এর শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা, যোগাযোগ, গল্প, কাহিনী, বর্ণনা, কথোপকথন, আলাপ, ধার্মিকতা বা সাংসারিক বিষয়, ঐতিহাসিক অথবা নতুন ঘটনা।[৪] পবিত্র কুরআনেও হাদীস শব্দটি ২৮ বার উল্লেখিত হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ্ উত্তম হাদীস অবতীর্ণ করেছেন, তা হলো আল্লাহ্র কিতাব।'[৫]

এই নিবন্ধে সুন্নাহ্ শব্দটি রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ, তাঁর অনুমোদন (tacit approval) এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব চরিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সমাহার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (The Hadith or Sunnah is the total records of the words and deeds of the prophet Slm, as well as his silent approvals and the description of his person)[৬]

লেখক : ডীন, আইন অনুষদ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাদীসের গুরুত্ব

হাদীসের বা সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব মূলত এর বাহক মহানবী মুহাম্মদ স.-এর প্রেরণ বা তাঁর নবুয়াতের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, 'তিনিই তাঁর রসূল স.-কে হেদায়াত এবং সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে (ইসলাম) অপরাপর সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন। মুশরিকরা অপছন্দ করলেও।'[৭]

অতএব সুন্নাতে রাসূল ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না। অন্য কথায় সুন্নাতে রাসূল যেখানে অনুপস্থিত ইসলামও সেখানে অনুপস্থিত। পবিত্র কুরআন জানার ও মানার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌র ভূমিকা অপরিসীম। অতএব, সুন্নাতে রাসূলের গুরুত্ব, ভূমিকা ও ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক।

সুন্নাতে রসূল স.-এর ভূমিকা

১. *সুন্নাহ্‌র সাহায্যে কুরআনের ব্যাখা করা :* এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, 'হে নবী! আমরা এ কিতাবকে তোমার উপর নাযিল করেছি, যাতে তুমি তা মানুষের সামনে ব্যাখা করতে পারো, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।'[৮]

কুরআনের অসংখ্য বিষয় যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, আর তা সম্ভব সুন্নাতে রাসূল দ্বারাই। অতএব সুন্নাহকে কুরআনের সহায়ক হিসাবে কুরআন বুঝার প্রধান সহায়িকা বলা যায়।

২. *যাবতীয় মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমাধান দেয়া :* এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আল্লাহ্‌র নবীর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার তোমাদের কর্তৃত্বশীলদের। কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা (সমাধানের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সোপর্দ করো যদি তোমরা ঈমানদার হও আল্লাহ ও পরকালে এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।'[৯]

অর্থাৎ মানবজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তার সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ অন্য কোথাও নয়।

এখানে যাবতীয় বিরোধ, যেমন রোগ নির্ণয়, নৈতিকতার সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-সাহিত্য, সাংবাদিকতা, বিচার কার্যবিধি, সাক্ষ্য, আটক, জামিন, দেশান্তর, বিদেশে গমন ও দেশে ফেরায় বাধাদান, রাজনীতি, ইমারজেন্সি, স্থায়ী সরকার, স্বল্পকালীন সরকার, যুদ্ধ, সন্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, গর্ভপাত, টেস্ট টিউব বেবী, ক্লোনিং, কিডনী- চক্ষুদান, নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ সকল কার্যক্রমে বিদেশী বিশেষ করে বিধর্মীয় সাহায্য গ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য যেতে হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কাছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট পেশ করার অর্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করা। কোন বিষয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে মতভেদ হলে তার সমাধান উভয় পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

৩. আইন প্রণয়ন ও বিচার ফায়সালা দানে সুন্নাতে রাসূল স. : আল্লাহ্ স্বয়ং আইনের উৎস এবং আইনদাতা। রসূলুল্লাহ স.-কেও তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের এবং প্রণীত আইনানুযায়ী বিচার ফায়সালা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'কখনো নয়, তোমার প্রভুর শপথ! এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের যাবতীয় মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক না মানে এবং তোমার দেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা না থাকে, বরং তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।'[১০]

'এটা কোন নারী পুরুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে ফয়সালা দেয়া হয়ে গেছে এ বিষয়ে তাদের কোন দ্বিমত থাকা।[১১]

অতএব, রসূল স.-এর দেয়া যাবতীয় সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক- এ বিষয়ে পছন্দ অপছন্দের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছে : 'রাসূল তোমাদের প্রতি যাই করতে বলেন তাই কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।'[১২]

আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা যে রিসালাতের দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মোয়াজ বিন জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় রসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার আদালতে কোন মামলা আসলে কিভাবে তুমি এর ফয়সালা দেবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। কুরআনে না পাওয়া গেলে আল্লাহর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী। সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং তাতে অবহেলা করবো না। মুয়াজ রা.-এর জবাবে শুনে রাসূলুল্লাহ স. খুশি হন এবং তার জন্য দুআ করেন।'[১৩] এ হাদীস অনুযায়ী প্রথমত কুরআন, দ্বিতীয়ত সুন্নাহ এবং এ দু'য়ের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় দানের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়।

আইন প্রণয়নের ভূমিকা বিষয়ক অপর একটি কুরআনের বাণী হলো : 'হে নবী, আমরা এই কিতাবকে সত্যতা সহকারে আপনার উপর নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী আপনি মানুষের মাঝে ফায়সালা করতে পারেন।'[১৪]

রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রণীত বিধান এবং তাঁর রায় মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক। বিশর নামীয় এক মুসলিম এবং এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্র আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। মামলার রায় ইয়াহুদীর পক্ষে যাওয়ায় মুসলিম ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলো এবং উমর রা.-এর নিকট অভিযোগ আকারে পেশ করলো। উমর রা. তা শোনার পর অসন্তুষ্ট হলেন এবং বিশরকে হত্যা করলেন। কেসটি রাসূলুল্লাহ্র নিকট পেশ করা হলে তিনি উমরকে ডেকে পাঠালেন। উমর বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! লোকটি মুসলিম বলে দাবি করে অথচ আপনার দেয়া বিচারের রায় মেনে নিতে রাজী নয়। আল্লাহ্র নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক আর কে হতে পারে? এমন লোকের উপযুক্ত শাস্তি তাই হওয়া উচিৎ। রাসূলুল্লাহ এ বিষয়ে আর কিছু না বলে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা করলেন। এরি মধ্যে সূরা নিসার ৬৫নং আয়াত নাযিল হলো : 'এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নেয়।'[১৫]

৪. স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

যে ক্ষেত্রে কুরআন শুধু কিছু নীতিমালা দিয়েছে এর বিস্তারিত বিধান দেয়নি এ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌র ভূমিকা হচ্ছে স্বাধীনভাবে নতুন আইন বা বিধান প্রণয়ন করা। সুন্নাহ্‌র এ ভূমিকা ব্যাপক।

বর্তমান সময়ে সুন্নাহ্‌র কার্যকারিতা

ইসলাম একটি চির পুরাতন ও চির নতুন দর্শন। এর যাত্রা মানব জাতির ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই, অর্থাৎ আদম আ. থেকে। মুহাম্মদ স.-এর সর্বশেষ নবায়নকর্তা। তাঁর মাধ্যমে ইসলামের একদিকে পূর্ণতা, বিশ্বজনীনতা এবং চিরস্থায়ীত্ব দান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।[১৬]

এর দ্বারা মহানবীর বিশ্বজনীন হওয়া বুঝায়। আর ইসলামের চিরস্থায়িত্বের বিষয়টি এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাতে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। আমার পরে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন এ দু'টি জিনিসকে তোমরা ধারণ করে রাখতে পারবে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নাত।'[১৭]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তার পর আসবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, তার পর আসবে স্বৈরাচারের যুগ। পুনর্বার আবার রাসূলের পদ্ধতিতে পৃথিবীতে রাসূলের আদর্শে কায়েম হবে ইসলাম। ইসলামের পুনঃ বিজয়ের সর্বশেষ যুগটি এখনও আসেনি বলেই সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞ একমত। অতএব, সুন্নাতে রাসূলের পদ্ধতিতে পুনরায় বিশ্বব্যবস্থা কিয়ামতের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই হলো এ হাদীসের ভাষ্য। বিশ্ববাসী যতবেশি দীন কায়েমের লক্ষে শ্রম ও মেধা ব্যয় করবে তত দ্রুত 'আ'লা মিনহাজিন্নবুয়া' নববী আলোয় পৃথিবী রঞ্জিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ মুসলিমদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে সে কুরআন ও হাদীস বা সুন্নাহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর যাত্রাকাল থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ১৪২৯ হিজরী সন পর্যন্ত এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তা এ অবস্থায়ই থাকবে। এর নিশ্চয়তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমি কুরআনকে নাযিল করেছি আর তার সংরক্ষণের দায়িত্বও আমার।'[১৮]

যাদের উপর এ কুরআন নাযিল হয়েছে, যারা এর ধারক-বাহক তাদের পরিচয় তারা মুসলিম,[১৯] তারা আনসারুল্লাহ্,[২০] হিজবুল্লাহ্,[২১] মোত্তাকী,[২২] মুফলিহূন[২৩] ও মুহসিন। মুসলিম অর্থই হচ্ছে একজন আত্মসমর্পণকারী শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি, অশান্তি সৃষ্টি তার কাজ নয়। আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হিসেবে সুন্নাহর অনুসারীরা শয়তানের বা অপকর্মের সহযোগী হতে পারে না। হিজবুল্লাহ্ হিসেবে একজন মুসলিমের কাজই হলো দীনের হেফাজত করা, অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, মোত্তাকী হিসেবে তার দায়িত্ব হলো কেবলমাত্র ঐসব কাজই করা যাতে আল্লাহ্‌র অনুমোদন আছে আর তা বর্জন করা যাতে তাঁর অনুমোদন নেই। মুফলিহূন হিসেবে একজন মুসলিমই শুধুমাত্র দুনিয়া ও পরকালে সফল ব্যর্থতার গ্লানী তাকে কখনো স্পর্শ করবে না। আর মুহসিন হিসেবে তার কর্তব্য হলো সব সময় উত্তম ও ন্যায়সংগত কাজ করা মন্দ কাজ পরিহার করা এবং যাবতীয় কাজকর্মকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করা।

আল্লাহ্ প্রেমের পূর্বশর্ত হলো নবীর আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, 'হে নবী, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য কর। তাহলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং অপরাধসমূহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং চিরস্থায়ী শান্তিময় জান্নাত তোমাদের দান করবেন।'[২৪]

অতএব আল্লাহ প্রেম, অপরাধ মার্জনা এবং জান্নাত প্রাপ্তির স্বার্থেই সুন্নাতে রাসূল-এর মুসলমানদের সার্বিক জীবনে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। রাসূলের সুন্নাহ পালনে শুধু নয়, এর পুনঃরুজ্জীবনও মানবীয় কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্নাহ চালু করবে সে তার সওয়াব পাবে এবং যারা এর অনুসরণ করে সকলের সমপরিমাণ সওয়াবও সে পাবে, ততদিন পর্যন্ত যতদিন এ ভাল সুন্নাতটি জারি থাকে।[২৫]

আল্লাহ্র নবীর সুন্নাহই হচ্ছে মানবতার জন্য অনুসরণীয় মডেল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।'[২৬] অতএব, মানবতা যে যুগে যে সময়ে থাকবে ঐ সময়ের জন্যই সুন্নাতে রাসূলের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্যভাবে বিদ্যমান থাকছে ও থাকবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম বা সুন্নাতে রাসূল কার্যকর হবে একজন মুসলিমের উপর। অসংখ্য মুসলিম বর্তমান থাকতে সুন্নাতে রাসূল বা ইসলামী অনুশাসন কার্যকর না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এখন যা প্রয়োজন তা হলো মুসলিমদের ঈমানকে শাণিত করা। প্রশ্ন হতে পারে ইসলামের স্বর্ণযুগ ছিল উটের যুগ। আর বর্তমানে স্পেস শাটলের যুগ। বিজ্ঞানের গতিময় যুগে সুন্নাতে রাসূলের কার্যকারিতা কি করে খাপ খেতে পারে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, বিজ্ঞান ইসলামেরই সম্পদ। এর আবিষ্কারের সকল দ্বারে মুসলমানদেরই ছিল সফল পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যত বেশি উন্নত হবে, ইসলাম বা সুন্নাতে রাসূল বুঝার ক্ষেত্রে এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা তত বেশি সহায়ক হবে।

বর্তমান যুগে মানবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেও নৈতিকতার বিচারে তারা সাধারণ ভাবে পশুত্বের স্তরে নেমে যাচ্ছে। পশুত্ব এবং অজ্ঞতা যত বেশি বৃদ্ধি পায় ইসলামের আবেদনও সেক্ষেত্রে তত বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। রাসূলের যুগের জাহেলিয়াত ছিল বিশ্বজনীন। মানবতা ছিল রক্তপিপাসু ও কলহপ্রিয়। এমন মানুষকেই ইসলাম বানিয়েছিল মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত জাতি। সে ইসলাম আজও অবিকৃত। পরশপাথর এখনো বিদ্যমান, প্রয়োজন শুধু এর সঠিক ও যথার্থ প্রয়োগের। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে, তা এখনও প্রয়োগযোগ্য। সুন্নাহর্ বাস্তব প্রয়োগ যত বৃদ্ধি পাবে সমাজ ততোই কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে।

শেষ কথা

এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সুন্নাতুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের গুরুত্ব বুঝা এবং এর সফল বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে মানবতার মুক্তি কল্যাণ ও সাফল্য। মানবতার দুর্গতির জন্য দায়ী

হচ্ছে অবিশ্বাস, ধর্মহীনতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, লাম্পট্য, নীতিহীনতা, অসাধুতা, কামুকতা, অন্যায় অর্জন, ভোগ লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, পরনিন্দা, অপবাদ প্রবণতা, মিথ্যার বেসাতী, আমানতের খেয়ানত, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, দাম্ভিকতা, জবাবদিহিহীনতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, অপরাধীর পক্ষাবলম্বন করে বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত করে অসাধুকে সাধু বানানো ইত্যাদি। সুন্নাতে রাসূল এসব বিশৃংখলার বিরুদ্ধে একটা সফল বিপ্লবের নাম। অতএব সুন্নাতে রাসূলের প্রয়োগই পারে মানবতাকে এ দুর্নাম থেকে রক্ষা করে, প্রকৃত মানুষের স্তরে পৌঁছে দিতে। দুঃখজনক হচ্ছে, ক্ষতি যেমন রাতারাতি হয়নি, তেমনি এর থেকে রক্ষা পাওয়াও রাতারাতি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা।

তথ্যপঞ্জি

১. Madina, Maan Z. 1973. Arabic-English Dictionary, Pockets Books, New York, USA, p. 320. Azami, Mustafa, Studies in Hadith Literature and Methodology, Islamic Book Trust, Kuala Lampur, Malaysia, 1977, p. 3, N1a3ece. Imran Ahsan Khan, Islamic Jurisprudence, Islamic Research Institute Press, Pakistan, 2000, p. 162

২. আল কুরআন, আল ফাতের, ৩৫ : ৪২।

৩. Abu Daud, Sunan, Vol. 111, No. 4590

৪. Madina, Maan Z, Arabic- English Dictionary, Op. Cit. p. 143, Azamin, Mustafa, Studies in Hadith & Methodology, Op. Cit. P.1

৫. আল-কুরআন, সুরা যুমার, ৩৯ : ২৩।

৬. Abu Shaban, Muhammad, Al-wasit fi mustalah al Hadith, Jeddah, KSA, 1983, P. 15; Al Bitar, Muhammad, Qawaid al Hadith, Halabi Press, Cairo, Egypt, 1961, P. 61

৭. আল কুরআন, আল ফাক, ৬১ : ৯, আল বাকারা, ২ : ১১৯।

৮. আল কুরআন, আল নাহল, ১৬ : ৪৪।

৯. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ৫৯।

১০. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ৬৫।

১১. আল কুরআন, আল আহযাব, ৩৩ : ৩৬।

১২. আল কুরআন, আল হাশর, ৫৯ : ৭।

১৩. Abu Daud, Sunan, Vol. 111, P. 1019. Hadith No. 3585.

১৪. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ১০৫অ

১৫. Mahmudul Hasan, Hadrat Omar Faruq, Islamic Publications Ltd. Karachi, 1982, pp. 31-32.
১৬. আল কুরআন, আল আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।
১৭. Al- Shatibi, Munafiqat, Vol. 111, p. 197.
১৮. আল কুরআন, আল হিজর, ১৫ : ৯।
১৯. আল কুরআন, আল জুমার, ৩৯ : ১২।
২০. আল কুরআন, আল ছাফ, ৬১ : ১২।
২১. আল কুরআন, আল মুজাদিলা।
২২. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ২।
২৩. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ৫।
২৪. আল কুরআন, আল ইমরান, ৩ : ৩১।
২৫. মুসলিম, সহীহ্ কি ঃ তাফসির।
২৬. আল কুরআন, আল আহ্জাব, ৩৩ : ২১।

•

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ১৮-২৭

ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি একটি তুলনামূলক আলোচনা

মুহাম্মদ মূসা

। দুই ।

ইসলামী আইনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল এই আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের নিরন্তর গবেষণা। মুজতাহিদ ফকীহ্গণের উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রের প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও অর্থবিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় উদ্ভূত আইনী সমস্যা, তার সমাধান ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। আইন শুধু ঘরে বসে বই-পুস্তক নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই সমৃদ্ধি লাভ করেনি। বাস্তব কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে ফকীহগণ সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনগত সমাধান দিয়েছেন। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, দীর্ঘকালেও একটি আধুনিক সমাজের জন্য ইসলামী আইন কার্যকর ও উপযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পূর্বের নিবন্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে হত্যার অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হবে। উল্লেখ্য যে, কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তার তুলনায় লঘু দণ্ড প্রদান করা হয়, ইসলামী আইনেও এবং বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতেও। অবশ্য বাংলাদেশের আইনে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও আছে।

ইচ্ছাকৃত হত্যা ব্যতীত অন্যান্য হত্যাকাণ্ডকে ফকীহ্গণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

(ক) কতলে শিবহি আমদ: মনে হয় হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করেছে-এরূপ সন্দেহযুক্ত হত্যাকাণ্ডকে কতলে শিবহে আমদ বলে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, দেহ কাটে না বা দেহে বিদ্ধ হয় না এরূপ বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে তা-ই কতলে শিবহে আমদ এর আওতাভুক্ত। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ র.-এর মতে, যেসব বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় না এরূপ বস্তু, যেমন ক্ষুদ্র পাথর, ক্ষুদ্র লাঠি, চাবুক, কলম ইত্যাদি দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে সেই হত্যাকাণ্ডকে কতলে শিবহে আমদ বলে।[১]

এই হত্যার বিষয়ে হত্যাকারীর হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড না হয়ে তার উপর আর্থিক জরিমানা (দিয়াত) ধার্য হয়। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর

লেখক : ইসলামী আইনের গবেষক, গ্রন্থকার এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা।

সাহাবীগণ একমত। এই দিয়াত কতলে আমদ-এর দিয়াতের অনুরূপ। অর্থাৎ এক শত উষ্ট্রী বা তার সমসাময়িক বাজারমূল্য। এই দিয়াতের ভার বহন করবে হত্যাকারীর পরিবার ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আদালতের নির্ধারিত হার অনুযায়ী, নিহতের ওয়ারিসগণ এই দিয়াত লাভ করবে।

কতলে খাতা (ভুলবশত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড): কোন ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ নয় তার এমন কাজের পরিণতিতে ভুল বা অসাবধানতাবশত যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাকে কতলে খাতা বলে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে তার ভুল বা অসাবধানতার জন্য দায়ী করা হয়। কারণ কোন অনিষিদ্ধ কাজ অবশ্যই কারো ক্ষতিসাধন না করার শর্তে করা যেতে পারে। কর্তা প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলে হয়ত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। কর্তার ভুল তিনভাবে হতে পারে। (১) কাজের মধ্যে ভুল: যেমন কেউ একটি হরিণের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঝোপের মধ্যে লুকানো কোন ব্যক্তির দেহে বিদ্ধ হলো এবং তাতে সে মারা গেলো। (২) ধারণার মধ্যে ভুল: যেমন শিকারী হামাগুড়ি দিয়ে পথ অতিক্রমকারী একটি লোককে দূর থেকে পশু ধারণা করে তার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করলো এবং তাতে সে মারা গেলো। (৩) ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যে ভুল: যেমন হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলা ব্যক্তিকে পশু ধারণা করে তার প্রতি গুলি ছুড়লো এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঝোপের আড়ালে লুকানো অপর ব্যক্তির দেহে বিদ্ধ হলো এবং ফলে সে মারা গেলো।

কতলে শিবহে খাতা: অর্থাৎ ভুলবশত সংঘটিত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা সন্দেহপূর্ণ হত্যাকাণ্ড। ভুল বা অসাবধানতা বহির্ভূত কোন অনিষিদ্ধ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে কতলে শিবহে খাতা বলে। এক্ষেত্রে অপরাধীর সংকল্প ব্যতীতই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তবে তার কর্ম ও সংঘটিত দুর্ঘটনার মধ্যে 'কারণ'-এর সংযোগ (Relation of cause and effect) বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে উচ্চ স্থান থেকে সটকে পড়ে কোন পথচারীর উপর পতিত হলো এবং তাতে পথচারী মারা গেলো। উদাহরণে দেখা যায়, কর্ম ও নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্যে কারণ-এর সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।

কতল বিত-তাসাব্বুব: অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ হওয়া। কোন ব্যক্তির অসতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অপর ব্যক্তির জীবনহানি ঘটলে তাকে কতল বিত-তাসাব্বুব বলে। এখানে অপরাধীর কাজ ও হত্যার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবে তার কাজটি হত্যার কারণ হয়। যেমন কোন ব্যক্তি পথিপার্শ্বে তার জমিতে একটি ইঁদারা খনন করলো এবং তার চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করেনি। অন্ধকারে ঐ পথে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি তাতে পতিত হয়ে মারা গেলো।

এক বিবেচনায় এটি কতলে খাতার আওতাভুক্ত মনে হলেও অন্য বিবেচনায় তা কতলে খাতার আওতাভুক্ত মনে হয় না। যেমন ইঁদারা খননের দ্বারা কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা খননকারীর ছিলো না, বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে প্রাণহানি ঘটেছে। এদিক থেকে এটি

কতলে খাতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরদিকে কোন ব্যক্তির সরাসরি কাজটি দ্বারা ভুলবশত হত্যা সংঘটিত হয়, আর এখানে তার সবররাহকৃত কারণ দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে।

ভুলবশত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

'কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা অপর মুমিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মুমিন দাসকে দাসত্বমুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে দিয়াত (রক্তপণ) অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে একজন মুমিন দাসকে দাসত্বমুক্ত করা বিধেয়। আর যদি নিহত ব্যক্তি এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে তার পরিবারবর্গকে দিয়াত প্রদান এবং একজন মুমিন দাসকে দাসত্বমুক্ত করা বিধেয়। আর হত্যাকারী সংগতিহীন হলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে। অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এটাই আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' (সূরা আন-নিসাঃ ৯২)।

উপরোক্ত আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয় :

১. মুমিন ব্যক্তি কখনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে না। এক কথায় নরহত্যা নিষিদ্ধ।
২. ভুলবশত বা অসাবধান অবস্থায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
৩. এধরনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান হলো একটি মুমিন দাসকে দাসত্বমুক্ত করতে হবে, এবং
৪. ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে হত্যাকারী পক্ষ দিয়াত প্রদান করবে।
৫. ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ স্বেচ্ছায় তাদের প্রাপ্য দিয়াতের দাবি প্রত্যাহার বা ত্যাগ করতে পারে, অর্থাৎ হত্যাকারীকে নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা করতে পারে।
৬. রক্ত-মাংস ও আবেগ-অনুভূতিতে গড়া মানুষ হিসাবে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি হতে এবং বিদ্যমান থাকতে পারে (আরো দ্র. সূরা হুজুরাত, ৯ নং আয়াত)।
৭. শত্রুপক্ষের নিহত ব্যক্তি মুমিন হলে হত্যাকারী একজন মুসলমান দাস বা দাসীকে দাসত্বমুক্ত করবে।
৮. নিহত ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হলে ক্রমিক নং ৩ ও ৪-এ বর্ণিত ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম নিহতের দিয়াত একই সমান।
৯. হত্যাকারী দাসত্বমুক্ত করার জন্য মুসলিম দাস-দাসী না পেলে তাকে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে।
১০. প্রযোজ্য ব্যবস্থার অনুসরণ করার সাথে সাথে হত্যাকারীকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।

ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি

যে ব্যক্তি ভুলবশত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে (উপরোক্ত তিন শ্রেণীভুক্ত হত্যা), সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না হয়ে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিমাণ এক শত উষ্ট্রী বা তার বাজার মূল্যের

সমান নগদ অর্থ। রাসূলুল্লাহ স. উপরোক্ত দুই ব্যবস্থাই অনুমোদন করেছেন। উটের বেলায় তা পাচঁ শ্রেণীভুক্ত হবে। বিশটি বিনতে মাখাদ (এক বছর থেকে পূর্ণ দুই বছর বয়সের উষ্ট্রী), বিশটি ইবনে মাখাদ (ঐ বয়সের উট), বিশটি বিনতে লাবূন (তিন বছরে পদার্পণ থেকে বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত উষ্ট্রী), বিশটি হিক্কাহ (চতুর্থ বছরে পদার্পণ থেকে চার বছর পূর্ণ উষ্ট্রী) এবং বিশটি জাযাআহ্ (পাচঁ বছরে পদার্পণ থেকে বছর পূর্ণ হওয়া উষ্ট্রী)।[২]

রাসূলুল্লাহ স.-এর আমলে দিয়াতের আর্থিক মূল্য ছিল আট শত দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম এবং উমার রা.-এর খেলাফতকালে এক হাজার দীনার অথবা বারো হাজার দিরহাম।[৩] রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এক ব্যক্তি নিহত হলে তিনি হত্যাকারীর উপর বারো হাজার দিরহাম ধার্য করেন।[৪]

শিশু ও পাগলের হত্যাকাণ্ড

অনূর্ধ্ব নয় বছরে শিশুর অপরাধ দণ্ডবিধির ৮২ ধারামতে অপরাধ নয়। অর্থাৎ এই বয়সের শিশু আইনের চোখে নিরপরাধ। নয় থেকে বারো বছরের শিশু অপরিণত বোধশক্তিসম্পন্ন হলে সেও ৮৩ ধারামতে নিরপরাধ। তবে নয় থেকে বারো বছর বয়সের শিশু নিজের কাজের পরিণতি বুঝতে সক্ষম প্রমাণিত হলে তার কৃত অপকর্ম অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এই দুই ধরনের শিশুকে 'সগীর গায়ের মুমায়্যিয' (অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু) ও 'সগীর মুমায়্যিয' (পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু) বলে। অনুরূপভাবে ৮৪ ধারামতে পাগলের অপরাধমূলক কার্যকলাপও অপরাধ নয়। এদের নরহত্যার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

ইসলামী আইন মতেও শিশু ও পাগল নিরপরাধ। উভয়ের ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত নরহত্যা একই প্রকৃতির। এই অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং ওয়ারিসী স্বত্ব থেকেও তারা বঞ্চিত হবে না।[৭]

মহানবী স. বলেন, 'তিন ব্যক্তির দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; শিশু, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী হয়।'[৮] উভয়ে মালদার হলে তাদের উপর দিয়াত ধার্য হবে।

দণ্ডবিধির ৮৩ ধারামতে সগীর মুমায়্যিয তার অপরাধ কর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। দণ্ডবিধিতে মোটামুটি ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসাবে গণ্য। ইসলামী আইনে সরকারি চাকরি ও সেনাবাহিনীতে প্রবেশ লাভের বয়স ১৪ বছর, কিন্তু দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স সীমার উপর নির্ভর না করে সাবালকত্বের নিদর্শনাদি, যেমন দাড়ি গজানো, গুপ্ত স্থানে লোম গজানো (মেয়ের ক্ষেত্রে) মাসিক ঋতু হওয়া এবং বক্ষ উন্নত হওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করা হয় এবং সেই সাথে বোধশক্তিও বিবেচনায় রাখা হয়। কোন শিশু বালেগ হওয়া সত্ত্বেও তার বোধশক্তির উন্মেষ না ঘটলে অর্থাৎ নির্বোধ, সেও নাবালেগের পর্যায়ভুক্ত।

পাগল ও নাবালেগের আক্রমণ

পাগল বা নাবালেগের সশস্ত্র আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তি তাদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে পাগল বা নাবালেগকে হত্যা করলে হানাফী মাযহাব মতে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফিঈ র.-এর মতে দিয়াতও প্রযুক্ত হবে না। ইমাম শাফিঈ যুক্তি দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ জানমালের নিরাপত্তা বিধানের অধিকার রয়েছে।[৯] মহানবী স. বলেন, 'তোমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রধারণ করো।'[১০]

বিভিন্ন পন্থায় হত্যা

শ্বাসরুদ্ধ করে, আগুনে বা পানিতে ফেলে, উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে, বিষাক্ত পদার্থ পান করিয়ে, মাটিতে পুঁতে, অভুক্ত রেখে, অতি গরমে বা ঠাণ্ডায় আটক রেখে কাউকে হত্যা করা হলে প্রমাণ সাপেক্ষে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধির মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।

তুলনামূলক আলোচনা

আইনের বিস্তৃতি

ইচ্ছাকৃত নরহত্যা ও ভুলবশত নরহত্যা এবং এর শ্রেণীবিভাগ ও প্রতিবিধান সম্পর্কে ইসলামী আইনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ করে স্বতন্ত্রভাবে তার বিধান বর্ণিত হয়নি। বলতে গেলে এখানে তা এতই সংক্ষিপ্ত যে, একজন বিশেষজ্ঞ আইনবিদ ব্যতীত তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনটি কি ধরনের ঘটনা তা সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

শাস্তি

বাংলাদেশে উপরোক্ত সকল শ্রেণীভুক্ত নরহত্যার শাস্তি ক্ষেত্রভেদে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড এবং এর সাথে আর্থিক জরিমানাও কখনো কখনো যোগ করা হয়। কারাদণ্ড ক্ষেত্রভেদে সশ্রম ও বিনাশ্রমও হয়ে থাকে। এসব শাস্তি নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিচারকের সুবিবেচনার উপর।

পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নরহত্যার ক্ষেত্রে আমরা যেসব শাস্তির বিধান লক্ষ্য করি তা হচ্ছে: মৃত্যুদণ্ড, অর্থদণ্ড, দাসত্বমুক্তকরণ এবং একাধারে দুই মাস রোযা রাখার মাধ্যমে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ। এখানে কারাদণ্ড অনুপস্থিত। দাসত্বমুক্ত করার জন্য ক্রীতদাস দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ক্ষেত্রেই বিকল্প হিসাবে রোযা রাখতে হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে অপরাধীর নৈতিক দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে, বিচারকের পক্ষ থেকে নয়।

মৃত্যুদণ্ড

ইসলামী আইনে মৃত্যুদণ্ড কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রদান করা হয়, যেখানে ঐ শাস্তির বিকল্প শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সাথে বাংলাদেশের দণ্ডবিধির সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত নরহত্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইসলামী আইনে এক্ষেত্রে উপরোক্ত শাস্তির বিধান নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, মানবজীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বেলায় ইসলামী আইনে মৃত্যুদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা সমান প্রতিশোধ (যেমন হাতের বদলে হাত, নাকের বদলে নাক, যদিও খুবই বিরল) গ্রহণের বিধান রয়েছে।

কারাদণ্ড

যে কোন দেশের দণ্ডবিধিতে দীর্ঘ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ইসলামী আইনে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা থাকলেও তাতে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এধরনের দীর্ঘমেয়াদী শাস্তির কারণে অপরাধীর প্রাপ্য মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়, শাস্তি ভোগকারীর মধ্য থেকে মানুষসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো নষ্ট হতে থাকে এবং তার পরিবারের সদস্যরা নানারূপ আর্থিক ও মানসিক কষ্টের শিকার হয়। ফলে অপরাধীর পাশাপাশি তার পরিবারবর্গও এক ধরনের অঘোষিত শাস্তি ভোগ করতে থাকে। তাই ইসলাম দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তির পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী বা উপস্থিত শাস্তি বেছে নেয়। এই ক্ষেত্রে শাস্তির ইসলামী ব্যবস্থা দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার তুলনায় উত্তম।

কারাদণ্ড প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। হযরত ইউসুফ আ.-এর কারাজীবনের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। বর্তমান কারা ব্যবস্থায় কারাদণ্ড ভোগকারী অপরাধী আরো ভয়ংকর দুর্ধর্ষ অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। কিন্তু ইসলামের কারা ব্যবস্থায় হযরত ইউসুফ আ.-এর আদর্শ অনুসরণ করা হয়। তাকে যখন অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং তিনি কোনমতেই সম্রাজ্ঞীর প্ররোচণা থেকে নিস্কৃতি পাচ্ছিলেন না তখন বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়।'[১১]

মহান নবী হযরত ইউসুফ আ.-এর নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের কারাগারসমূহ হবে এক একটি আদর্শ শিক্ষাগার। সেখানে এক দাগী অপরাধীও তার মুক্তির দিন একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে সমাজের জন্য কল্যাণ হিসেবে বেরিয়ে আসবে। ইউসুফ আ. কারাগারে প্রবেশ করেই তাঁর সহ-কারাবন্দীদের জন্য যা করলেন তা কুরআনের ভাষায় : 'যে সম্প্রদায় আল্লাহর উপর ঈমান আনে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের ধর্মাদর্শ মান্য করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ

মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক উত্তম, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা কেবল কতগুলো নামসর্বস্ব জিনিসের পূজা করছো, যে নামগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন– তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে। এটাই শাশ্বত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করে না।'[১২]

রসূলুল্লাহ স.-ও যাদের সাময়িকভাবে বন্দী করেছিলেন তাদের মধ্যে শিক্ষিতদের শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত করেন এবং অশিক্ষিতদের শিক্ষাদান করেন। ইসলামের এটাই অন্যতম কারানীতি। কারবন্দীর অবসর জীবনকে সে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে দেয়। বাকি মুক্ত জীবন সে আর অন্ধকারে ফিরে যায় না।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে গণশিক্ষার আওতায় নিতে পারলে এদেশের অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রইলো।

অর্থদণ্ড

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে মানবজীবন ও দেহের ক্ষতিসাধনের অপরাধে ইসলামী দণ্ডবিধির অনুরূপ অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার প্রকৃতি, পরিমাণ ও তার প্রাপক ইত্যাদির দিক থেকে পার্থক্য আছে। যেমন ইসলামী আইনে তা নগদ অর্থে বা পশুর দ্বারা পরিশোধযোগ্য, তার পরিমাণ রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক সুনির্ধারিত এবং তার প্রাপক হলো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের দণ্ডবিধিমতে তা অর্থের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য, বিচারক তার সুবিবেচনামতে পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং এর প্রাপক হলো সরকার।

এদিক থেকে ইসলামী আইনের ব্যবস্থাটি দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর। কারণ অপরাধী অর্থদণ্ডের বোঝা বহন করে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড থেকে রেহাই পায় এবং নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন ও তাদের সেবা করার সুযোগ পায়। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা পশুসম্পদ লাভ করে তাদের ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারে।

অর্থদণ্ড ও পাশ্চাত্যের চিন্তা

বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে যে, অপরাধীকে শাস্তি দিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কিছুটা শান্ত্বনা লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু একটি মানুষের জীবনাবসান বা তার দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার পরিবারের যে মারাত্মক ক্ষতি হলো তার প্রতিকার কিভাবে করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে, যেমন ইটালি ও ফ্রান্সে সীমিত আকারে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

অথচ ইসলামী আইন তার সূচনালগ্ন থেকেই ক্ষতিপূরণের এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। অতএব বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে সংশোধনী আনয়ন করে ইসলামী ব্যবস্থাটি প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে যা খৃস্টান বিশ্ব ইতিমধ্যেই চালু করতে শুরু করেছে। এদিকে আমাদের দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উপমহাদেশে খৃস্টান শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আইনের এই সুব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেও এখানে তার বাস্তবায়ন করেনি প্রধানত দু'টি কারণে। (এক) এটি তৎকালে তাদের কাছে একটি অভিনব ব্যবস্থা মনে হয়েছে, যার সাথে তারা কোন কালেও পরিচিত ছিলো না এবং সাথে সাথে হয়ত এটাকে অযৌক্তিক মনে করেছে। (দুই) এই ব্যবস্থা চালু করলে উপকৃত হতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উপমহাদেশের জনগণ। তারা তো এতদঞ্চলের মানুষের উপকার করতে আসেনি, এসেছিল শাসন করতে, শোষণ করতে ও নির্যাতন করতে।

কিসাস ও দিয়াত রহিত হলে বিকল্প শাস্তি

অপরাধী কোন কারণে মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পেলেও তাকে ভিন্নরূপ শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার আদালতের আছে কিনা এবিষয়ে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারণ হত্যাকারী একটি জীবনের অবসান ঘটিয়ে শুধু একটি পরিবারের ক্ষতিসাধন করে না, বরং সামাজিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করে। তাই কোন কারণে সে কিসাস ও দিয়াত থেকে অব্যাহতি পেলেও তার কিছু শাস্তি হওয়া উচিৎ। ইমাম মালেক র. তার এক শত বেত্রদণ্ড ও এক বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ র.-এর মতে হত্যাকারী পেশাদার দুস্কৃতিকারী হলে রাষ্ট্র তাকে তা'যীর-এর আওতায় যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারে।[৫]

জরিমানার অর্থ (দিয়াত) পরিশোধে অক্ষম হলে

অপরাধী জরিমানার অর্থ প্রদানে অক্ষম হলে বাংলাদেশের আদালত তার কারাদণ্ডের মেয়াদ বর্ধিত করে দেয়। কিন্তু ইসলামী আইনে অর্থ প্রদানে অক্ষমতার ক্ষেত্রে তার বিভিন্নরূপ বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত, আদালতের নির্ধারিত কিস্তি অনুসরণ করে সে ক্রমান্বয়ে তা পারিশোধ করতে পারে। (দুই) সে আর্থিকভাবে একান্তই অসচ্ছল হলে তার আত্মীয়-স্বজন ও চাকুরীস্থলের তার সহকর্মীবৃন্দ তাকে সহায়তা করবে। (তিন) যাকাত বা অনুরূপ কল্যাণ তহবিল থেকে রাষ্ট্র তা পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব না হলে

হত্যাকারী শনাক্ত হওয়া বিচার প্রক্রিয়ার অন্যতম শর্ত। অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য চলতে পারে, কিন্তু কে অপরাধী তা অজ্ঞাত থাকলে বিচারকার্য অনুষ্ঠান অসম্ভব। এক্ষেত্রে যে কোন দেশের

আইনে মামলা দায়ের করা যায়, কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় না। তবে ইসলামী আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। হাদীস শরীফে এর নজিরও রয়েছে। মহানবী স.-এর সাহাবী মুহায়্যাসা ইবনে মাসউদ রা. খায়বার এলাকায় আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে নিহতের ভাই হুয়ায়্যাসা রা. মোকদ্দমা দায়ের করেন। মহানবী স.-এর নির্দেশে উক্ত এলাকায় তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। শেষে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে দিয়াতস্বরূপ এক শত উট দান করেন।[৬]

মৃত্যুদণ্ড আইন বিলোপ আন্দোলন

জাহিলী যুগে একদল লোক প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে সীমা লংঘন করে হত্যার অপরাধে এক ব্যক্তির পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করতো। বর্তমান জাহিলী যুগে একদল লোক ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করছে। তারা মৃত্যুদণ্ডকে একটি বীভৎস প্রক্রিয়া আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তারা মৃত্যুদণ্ডকে মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে কোন কোন দেশ মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলোপ করেছে।

কুরআন মজীদ বিংশ শতকের এই জাহিলিয়াতের প্রতিবাদ করে প্রতিভাবান লোকদের সতর্ক করে দিচ্ছে যে, জাতির প্রকৃত জীবন 'কিসাস' অর্থাৎ নরহত্যার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উপর নির্ভরশীল। 'হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়! কিসাস কার্যকর করার মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে।' (২ : ১৭৯)

যে সমাজ মানুষের জীবনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীকে সম্মান প্রদর্শন করে, সে সমাজ নিজেই নিজের সমাধি রচনা করে। সে সমাজ হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে বহু নির্দোষ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। দানিয়েল ওয়েবেস্টার তাই বলেন, Every unpunished murder takes away something from the security of every man's life. 'যে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি বিধান করা হয় না সেই হত্যাকাণ্ড প্রত্যেক মানুষের জীবনের নিরাপত্তা হরণ করে।'

তথ্যপঞ্জি

১. বাদাইউস সানাই, ৭খ, পৃ. ২৩৩, ২য় সং, বৈরুত ১৪০২ হি./১৯৮২ খৃ.। আবু দাউদ, দিয়াত, বাব ১৭, নং ৪৫৪৭, বাব ২৪, নং ৪৫৮৮; নাসাঈ, কাসামা, বাব ৩৩-৪, নং ৪৭৯৭; ইবনে মাজা দিয়াত, বাব ৫, নং ২৬২৭।

২. আবু দাউদ, দিয়াত, বাব ১৬, নং ৪৫৪১, ৪৫৪৫, বাব ১৭, নং ৪৫৫২; তিরমিযী, দিয়াত, বাব ১, নং ১৩৮৬, নাসাঈ, কাসামা, বাব ৩৪-৫, নং ৪৮০৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, বাবা ৬, নং ২৬৩১।

৩. আবু দাউদ, দিয়াত, বাব ১৬, নং ৪৫৪২।

৪. আবু দাউদ, দিয়াত, নং ৪৫৪৬; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৮৮-৯, নাসাঈ, কাসামা, বাব ৩৫-৩৬, নং ৪৮০৮; দারিমী, দিয়াত, বাব ১১, নং ২৩৬৩।

৫. ইবনে রুশদ আল-মালিকী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২খ, পৃ. ৩৩৮; আত তা'যীর ফিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২২৮।

৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কাসামা, বাব ১, নং ৪৩৪২/১; হাদীসটি সিহাহ সিত্তার অনান্য গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

৭. ফাতওয়া আলমগীরী, ৬খ, পৃ. ৩-৪।

৮. বুখারী, হুদূদ ও তালাক; আবু দাউদ, হুদূদ; তিরমিযী, ঐ; দারিমী, ঐ; ইবন মাজা, তালাক; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ. ১০০।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ২৮-৪১

ঘরে প্রবেশ করার ইসলামী বিধান

প্রফেসর আ.ন.ম. রফীকুর রহমান

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষ বাস করে। প্রত্যেকেরই রয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী পুত্র পরিজন ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব, বিভিন্ন পেশার লোকদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। এদের প্রত্যেকেরই সাথে রয়েছে একে অপরের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের ভিতকে মজবুত করার জন্য রয়েছে ইসলামের জোর তাকিদ। যেমন প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সামাজিক বন্ধন। সাপ্তাহিক জুমআ', বাৎসরিক দু'ঈদ সামাজিক বন্ধনের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, লোকালয় বাদ দিয়ে একাকী বসবাস করার কোন সুযোগ নেই। খৃষ্টানগণ বৈরাগ্যবাদকে দীন হিসেবে গ্রহণ করলে তার প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেন, 'তারা বৈরাগ্যবাদের মনগড়া পথ অবলম্বন করেছে; আমি তাদেরকে এ হুকুম দেইনি।'[১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।'[২]

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুময় করার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয় নম্রতা প্রদর্শন কর এবং প্রতিবেশী আত্মীয়, প্রতিবেশী অনাত্মীয়, সফরের সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্ত দাস দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[৩]

প্রতিবেশী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'[৪]

'আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়! জিজ্ঞাসা করা হল, সে কোন ব্যক্তি হে আল্লাহর রসূল, তিনি উত্তর দিলেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'[৫]

'জিবরাঈল আ. আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সদা নির্দেশ দিতে থাকেন। তাতে আমার মনে হতে লাগলো যে, শীঘ্রই হয়তো তাদেরকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।'[৬]

লেখক: চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তার উচিত আত্মীয়ের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা।'[৭]

'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'[৮]

আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা, একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ডের প্রতি ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ভাল কাজকে অবজ্ঞা করে কখনও ছেড়ে দেবে না, যদিও তা হোক তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত।'[৯]

আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ এবং মুমিন মহিলা একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা পরস্পর পরস্পকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে।'[১০]

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, ফিরে আসা পর্যন্ত সে বেহেশতের ফল চয়নে রত থাকে।'[১১]

বিপদগ্রস্ত অভাবী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার তাকিদে আল্লাহর রসূল বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কেয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি, আদম সন্তান বলবে, হে রব! আমি কিভাবে আপনার সেবা করব, আপনিতো সমস্ত আলমের রব, আল্লাহ্ বলবেন- তুমি কি জানোনি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানোনা যে, যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহলে তার নিকট তুমি আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছি, তুমি আমাকে খাবার খাওয়াও নি। আদম সন্তান বলবে, আমি কিভাবে আপনাকে খাওয়াব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানোনা যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার খাওয়াওনি। শোনো, তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে, তাহলে তথায় তুমি আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। আদম সন্তান বলবে, হে রব, আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাবো, আপনি তো রাব্বুল 'আলামীন! আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। শোনো, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তাহলে তথায় তুমি আমাকে পেতে।[১২]

এ সমস্ত সম্পর্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনের তাকিদে একজন মানুষকে আর একজন মানুষের নিকট যেতে হয়। অপরের বাড়ীতে প্রবেশ করতে হয়। আত্মীয় অনাত্মীয় পরিবারের বিভিন্নজনের ঘরে প্রবেশ করা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। ইসলাম আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়সহ সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে । ঘরে প্রবেশ করার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সুন্দর বিধান দিয়েছে ইসলাম। যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

সূরা আন-নূরের শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল যেমন যিনা, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি, সেগুলো ছিল সমাজে অসৎ প্রবণতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কিভাবে তার গতিরোধ করতে হবে, তার বর্ণনা। আল্লাহ্‌র শরী'আত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যে সব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া শরী'আত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাবে না।'[১৩]

এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌঁছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সব সময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিনিয়ত পাকড়াও হবে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম মানুষের সহানুরভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারী দীন। তাই মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিস্কৃতি লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সমাজে যিনা, ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধের মূল কারণই হচ্ছে লোকদের পরস্পরের গৃহে নির্বিচার আসা যাওয়া করা, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশা, মেয়েদের গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে দেখা সাক্ষাত বৈধ নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিত লোকদের সামনে পর্দা না করা, সাজসজ্জা করে বের হওয়া ইত্যাদি। ইসলাম অসৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি ও অসৎপ্রবণতা রোধে অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিধান জারী করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম বিধান হল ঘরে প্রবেশ করার বিধান। জাহেলী যুগে আরবদের নিয়ম ছিল, তারা সুপ্রভাত, শুভসন্ধ্যা বলতে বলতে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করতো।[১৪] অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহমালিক ও তার বাড়ীর মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলত। আল্লাহ তাআলা এই বিব্রতকর অবস্থা প্রতিরোধের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে চাই তা মালিকানা হোক অথবা ভাড়া করা হোক অথবা যে কোন ভাবেই হোক, সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার রয়েছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। তাই কারো গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেয়া ও সালাম দেবার বিধান জারী করে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেছেন।

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভাল পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এটাকে স্মরণ রাখবে।'[১৫]

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমূল্য নেয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন।'[১৬] এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছে।

'প্রকৃত মুসলিমতো সে-ই যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।'[১৭]

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর বড় উপকারিতা হচ্ছে

প্রথম. মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দেয়া থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও।

দ্বিতীয়. স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রার্থীর উপকারিতা । সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। অথবা অন্য কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে পরামর্শ দেয়া বা সমস্যা থাকলে তা নিরসনে দরদী হয়ে এগিয়ে আসবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয়. নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্রাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ. মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারও ঘরে প্রবেশ করে গোপন বিষয় অনুমতি ব্যতিরেকে জানার চেষ্টা করা কবীরা গোনাহ্ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে সেটি অবমাননাকর মর্যাদাহানিকর মনোপীড়াদায়ক।

পঞ্চম. আল্লাহর নির্দেশ, অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করা। আল্লাহর বান্দা হিসেবে তা মেনে নেয়াই কল্যাণকর। তার প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহ্ বলেছেন, তাতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে, আশা করি তোমরা এ থেকে উপদেশ নেবে।'[১৮]

অনুমতি নেয়ার ইসলামী নীতি

১. দু'টি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না।

প্রথমত. সম্মতি নেয়া। কুরআন করীম 'হাত্তা তাস্তানিসূ' শব্দটি ব্যবহার করেছে। 'তাস্তানিসূ' শব্দটির মূল হল 'উন্স' যার মানে পরিচিতি, অন্তরঙ্গতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ শব্দটির মাঝে ইংগিত রয়েছে যে, প্রবেশের পূর্ব অনুমতি লাভ দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতংকিত হয় না। কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ করে না।

দ্বিতীয়ত. কাজ হচ্ছে গৃহের লোকদেরকে সালাম করা, কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি নিবে, পরে গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রখ্যাত মুফাসসির কুরতুবী এমতকে পছন্দ করেছেন। মাওয়ারিদ বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে , তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে, পরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে।

ইমাম বোখারী রা. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করনে যে, যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে প্রথমে অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দিও না, যতক্ষণ না সে সালাম করে।

অতএব সুন্নাত নিয়ম হল প্রথমে সালাম করবে অনুমতি নেয়ার জন্য, এ সালামের মাধ্যমে ঘরের লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এরপর অনুমতি নিয়ে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। অধিকাংশ ফকীহ্ এমতকেই গ্রহণ করেছেন। ইমাম নববী র. বলেন, এ মত-ই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা হাদীসে রয়েছে, 'কথা বলার পূর্বে সালাম।'[১৯]

প্রথম প্রথম যখন অনুমতি নেয়ার বিধান জারী হয়, তখন লোকেরা তার নিয়মকানুন জানতো না, একবার বনু আমেরের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাদেমকে বললেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না, বাইরে গিয়ে তাকে ঘরে প্রবেশ করার নিয়ম শিখিয়ে দাও, তাকে বল সে যেন বলে 'আস্সালামু আলাইকুম' আমি কি প্রবেশ করব? খাদেম বের হওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আস্সালমু আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করব? বলল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন, লোকটি প্রবেশ করল।[২০]

কালদাহ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম না দিয়েই প্রবেশ করলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ফিরে যাও, তারপর বল 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?'[২১] ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদীসটি হাসান। বায়হাকী হযরত যাবেরের বর্ণনায়

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন, যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না।[২২]

২. অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল, নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাইবে। হযরত উমর রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তিনি সালামের পর বলতেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি?[২৩] সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে এলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম দিয়ে প্রথমে নিজের নাম আবু মুসা বলেছেন এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশ'আরী বলেছেন।[২৪] এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত জবাব দেয়া যায় না।

৩. অনুমতি চাওয়ার পর যখন ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করে কে? উত্তরে শুধু আমি বলা যাবে না, বরং এমন নাম বলতে হবে, যে নাম পরিচিত। শুধু 'আমি' জিজ্ঞাসার জবাব নয়। খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলি ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরাহ ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন কে? উত্তর হল, 'আনা' অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারও নাম 'আনা' নেই। এর পর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজার কড়া নাড়লেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন কে? উত্তরে জাবের বললেন 'আনা' অর্থাৎ আমি, এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাসিয়ে বললেন, 'আনা' 'আনা' (আমি, আমি) বললে কাউকে চেনা যায় কি?[২৫]
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মে'রাজে গেলেন, প্রতি আকাশেই জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দরজা খুলে দেয়ার অনুমতি চাইলে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হল, কে? উত্তরে জিবরাঈল নিজের নাম বলে দিলেন 'জিবরাঈল'।[২৬]

৪. অনুমতি নেয়ার জন্য তিনবার ডাক দেয়ার বিধান রয়েছে। আবার তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সেজন্য তারা যদি জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে। আবু মুসা আশ'আরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনুমতি চাইতে হবে তিনবার, যদি অনুমতি দেয় প্রবেশ করবে, নতুবা ফিরে যাবে।[২৭] একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ বিন উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয়বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম

ও রহমতের দু'আ বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম।[২৮] হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত উমর রা.-এর নিকট প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেলেন। পরে উমর রা. তাকে ডেকে এনে ফিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবু মুসা আশ'আরী উত্তরে বললেন, এমনিভাবে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহর রসূল স. আমাদেরকে আদেশ করেছেন।[২৯]

৫. অনুমতি নেয়ার বিধান নারী পুরুষ মাহ্‌রাম ও গায়র মাহ্‌রাম সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। এমনকি কেউ যদি তার নিজের মা, বোন অথবা কোন মাহ্‌রাম নারীর কাছেও যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া অবশ্যক।

ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাইব? তিনি বললেন হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমিতো আমার মায়ের গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন: তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি, তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।[৩০] জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা রা.-কে জিজ্ঞেস করল, আমার বোনের নিকট যেতে কি আমি অনুমতি নেব? তিনি বল্লেন, যদি অনুমতি না নাও, তাহলে তুমি এমন কিছু দেখতে পার, যা তোমার পছন্দনীয় নয়।[৩১] আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার বোনের নিকট যেতে অনুমতি নেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম, সেতো ঘরে আমার সাথে থাকে, আমি তার খরচ বহন করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি নিতে হবে?[৩২]

৬. মহিলারাও অন্য মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নিবে। সাহাবা কেরামের স্ত্রীদের অভ্যাস তাই ছিল। হযরত উম্মে আয়াস রা. বল্লেন, আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়শা রা.-এর গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম, তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতাম।[৩৩]

৭. গৃহে যদি শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব এই যে, সেখানেও হঠাৎ করে বিনা খবরে না গিয়ে, প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলাঝেড়ে হুশিয়ার করে প্রবেশ করবে। হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব বলেন, আব্দুলাহ যখন বাহির থেকে গৃহে আসতেন, তখন প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে,

গলায় আওয়াজ করে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দীয় অবস্থায় না দেখেন।[৩৪]

৮. কারো বাড়ীতে অনুমতি নেয়ার সময় এতজোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে উঠে, বরং মাঝারি ধরণের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং কোনরূপ রুক্ষতা প্রকাশ না পায়।[৩৫] যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় কড়া নাড়তেন, তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে তাঁর কষ্ট না হয়।[৩৬]

৯. কারো বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়াবে না, বরং ডানপাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি নিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, যখন কারো বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না, কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বামপাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন।[৩৭] হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে, সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৮] ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়ানোর কারণে দরজা খুলতে আসা গায়রে মাহরাম মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরের গোপনীয় বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়তে পারে অন্য হাদীছে আছে, 'ঘরে যদি দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন কি?'[৩৯]

১০. যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায়, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যেতে বলে, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত। অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার উপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও , তাহলে ফিরে যাবে, এটি তোমাদের জন্য বেশি শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি।'[৪০] জনৈক বুযুর্গ বলেন, 'আমি সারা জীবন এ আশায় ছিলাম যে, কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং জবাবে সে আমাকে ফিরে যেতে বলবে, তখন আমি ফিরে এসে কুরআনের এ আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করব। কিন্তু হায়, এ নেয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।'[৪১]

১১. যদি কেউ কোন আলেম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ও খবর দেয়া ব্যতীত এ অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তাহলে বৈধ হবে, বরং এটাই হবে আদব ও শিষ্টাচার। কুরআন নির্দেশ দেয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দিয়ে আহ্বান করা আদবের খেলাফ, বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মোতাবেক বাইরে আগমন করবেন, তখন সাক্ষাত করা উচিত। আল্লাহ বলেন, 'আপনি বের হয়ে

তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে তা হত তাদের জন্য উত্তম।'[৪২]
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু একে আমি আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই।[৪৩]

১২. ইসলামী শরী'আত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সূরা নূরে যেমন আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে যার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে, তারও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তা হলো, বড় হলে সম্মানী ব্যক্তি হলে তাকে সম্মান করা, ছোট হলে স্নেহ করা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি হলে বিপদ দূরীকরণে তার সহযোগিতা করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, 'যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।'[৪৪]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লোকদেরকে তাদের শান অনুযায়ী মর্যাদা দাও।'[৪৫]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ছোট্ট বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ সে কারণে তার পরকালের বিপদগুলো থেকে বড় একটি বিপদ দূর করবেন।'[৪৬]

হাদীসে আছে, একজন মুসলিমের উপর অপর একজন মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল 'ডাকে সাড়া দেয়া'।[৪৬]

অতএব সাক্ষাতপ্রার্থীর যেমন সময় বুঝে সাক্ষাত করতে যাওয়া উচিত, তেমনিভাবে যার সাথে সাক্ষাত করতে যাবে, তারও উচিত হবে সাক্ষাতপ্রার্থীর অবস্থা, প্রয়োজন, মর্যাদা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সাথে সাক্ষাত দেয়া। গুরুতর অসুবিধা না হলে সাক্ষাত করতে অস্বীকার না করা।

১৩. এমন গৃহ যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়, বরং সেটাকে ভোগ করা ও সেখানে প্রবেশ করার এবং অবস্থান করার অধিকার সকলের রয়েছে, এমন সব গৃহে এবং স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। যেমন হাসপাতাল, পাঠাগার, মসজিদ, রেল-স্টেশন ইত্যাদি।

'যে গৃহে কেউ বাস করে না যাতে তোমাদের প্রয়োজন বা কল্যাণের বিষয় রয়েছে, এমন গৃহে (বিনানুমতিতে) প্রবেশ করতে তোমদের কোন পাপ নেই।'[৪৭] কিন্তু এমন সব স্থানেও প্রবেশ করার জন্য কর্তৃপক্ষ যদি কোন শর্ত আরোপ করে, তা হলে সে শর্ত মানা জরুরী। যেমন

রেল-স্টেশনের প্লাটফর্মে প্রবেশ করার জন্য টিকেট কেটে প্রবেশ করার শর্ত করা হল, অতএব এখানে এ শর্ত মেনেই প্রবেশ করতে হবে।

১৪. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সম্ভাবনা নেই এমন গৃহে প্রবেশ করতে কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই তবে এমন ঘরে প্রবেশ করতেও 'আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাহগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বলে প্রবেশ করা উত্তম।' আল্লাহ্ বলেন, 'যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা নিজেদেরকে সালাম দিবে।'[৪৯]
উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, যুহরী, মুজাহিদ, কাতাদা প্রমুখ বলেন, ঘরে প্রবেশ করার সময় ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকে সালাম করবে। আর যদি ঘরে কেউ না থাকে তা'হলে প্রবেশ করার সময় বলবে, 'আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন।'[৫০]

১৫. কারোর জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলেও আপনি আমার ঘরে বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্যকোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনি এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলার বাণী, 'যদি ঘরে তোমরা কাউকে না পাও, তা হলে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করবে না।'[৫১]

১৬. গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন কোন ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু অথবা নির্বোধ ব্যক্তি যদি বলে, এসে যান তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়। কেননা তাদের কর্মকান্ড শরীয়তে নির্ভরযোগ্য নয়।

১৭. শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা ঝড় তুফানে ভেঙে পড়ে কিংবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।[৫২]

১৮. কারও গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা, অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে বিষয়ে আপনি অবগত না হোন। গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এ উপকারিতা পন্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কাঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় উঁকি দিলেন।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন।[৫৩]

নবী করীম্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে তোমার কোন গুনাহ হবে না।[৫৪]

এ বিষয়ে অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।[৫৫]

ইমাম শাফেয়ী র. এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রয়োজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ার পরও সে নিরস্ত না হয়, এবং গৃহবাসীরা তাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না।[৫৬]

১৯. অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে বিভিন্নরূপে হতে পারে। যেমন সালাম দিয়ে অনুমতি নেয়া, দরজার কড়া নাড়িয়ে অনুমতি নেয়া, কলিংবেল বাজিয়ে অনুমতি নেয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে আরো নব পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে সর্বাবস্থায়ই অনুমতি নেয়ার জন্য পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

২০. তিনটি সময় রয়েছে, যে সময় দাসদাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কও ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। সে তিনটি সময় হল (ক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (খ) দুপুরে যখন বিশ্রামের জন্য অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখা হয়, (গ) এশার নামাজের পর। সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এ তিনটি সময় একান্তবাস ও বিশ্রামগ্রহণের সময়। এ সময় মানুষ ঘরে থাকলে খোলামেলা থাকতে চায়। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে শয়ন করা হয় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। আল্লাহ্ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীদের এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর, এ তিনটি সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়'।[৫৭]

২১. কোন অন্ধ ব্যক্তিও কারো ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। কারণ অনুমতি নেয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল কারো ঘরে গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া। ঘরের মালিক হয়ত তার স্ত্রী বা অন্য কোন আপনজনের সাথে এমন কথা বলছে, যা অন্য কেউ জানুক, তা পছন্দ করে না। অন্ধ ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করলে, এমন গোপন কথা জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও ঘরের মহিলাতো অন্ধ নয়, সেতো তাকে

দেখতে পারে, যা হবে অন্যায়। যেমন হাদীসে আছে; উম্মে সালামা বলেন, আমি ও মায়মুনা (দুজনই ছিলেন রাসূলের স্ত্রী) রসূলের নিকট ছিলাম। এমন সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন (তিনি ছিলেন অন্ধ) রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে কি অন্ধ নয়? সেতো আমাদেরকে দেখবেও না, চিনবেও না। রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা দুজনকি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না?[৫৮]

পরিশেষে বলব, ইসলামের আইন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি সুখী সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়া সম্ভব। এর বিকল্প কোন পথে তা চিন্তা করা বাতুলতাই মাত্র। আল্লাহ্ আমাদের সুমতি দিন, তাঁর পথে চলার তৌফিক দিন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন, সূরা আল্ হাদীদ, ৫৭:২৭।
২. মুসনাদে আহ্মাদ, খ.৬, পৃ.২২৬।
৩. আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ৪:৩৬।
৪. সহীহ্ মুসলিম, নং. ৪৬।
৫. সহীহুল বুখারী, খ.২, পৃ.৮৮৯, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৬. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.৩২৯, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৭. সহীহুল বুখারী, নং. ৩৭৩, সহীহ্ মুসলিম, নং. ৪৭।
৮. সহীহুল বুখারী, খ.২, পৃ.৮৮৫, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৯. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.৩২৯, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
১০. আল কুরআন, সূরা তওবাহ্, ৭:৭১।
১১. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.৩১৭, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
১২. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.৩১৮, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
১৩. আল কুরআন, সূরা ইসরা, ১৭:৩২
১৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খ.৩, পৃ.৩৫০। দারুল আলাম আলকুতুব, রিয়াদ, সৌদি আরব।
১৫. আল কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:২৭।
১৬. আল কুরআন, সূরা নাহাল- ১৬:৮০
১৭. সহীহুল বুখারী, খ.১, পৃ.৬, সং.৫০, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
১৮. আল কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:২৭।
১৯. সুনান তিরমিযী, খ.২, পৃ.৯৯, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ৬৫ চক সার্কুলার রোড, ঢাকা।
২০. সুনানে আবী দাউদ, খ.৭, পৃ.৭০৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।

২১. সুনানে আবী দাউদ, ঐ, সুনানে তিরমিযি খ.২, পৃ.৭৮, সং. ২৭১১, হামীদিয়া লাইব্রেরী, ৬৫ চক সার্কুলার রোড, ঢাকা।
২২. আদাবুল মুফরাদ, বুখারী। মায্হারী, ছানাউল্লাহ্ পানিপথি।
২৩. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।
২৪. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.২১১, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
২৫. সহীহুল বুখারী, খ.২, পৃ.৯২৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.২১১, সং. ২১৫৫, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
২৬. সহীহুল বুখারী, খ.১, পৃ.৫৪৯, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
২৭. সহীহুল বুখারী, খ.২, পৃ.৯২৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.২১১, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
২৮. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৫, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।
২৯. সহীহুল বুখারী, খ.২, পৃ.৯২৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৩০. তাফসীর তাবারী, খ.১৮, পৃ.১১২
৩১. আহকামুল কুরআন, জাস্সাস, দারুল কুতুব আল্ ইলমিয়্যাহ, খ.৩, পৃ.৪০৫ , বৈরুত, লেবানন।
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. তাফসীরে ইবন কাছীর, খ.৩, পৃ.৩৪৯, দারআলামিল কুতুব, রিয়াদ, সৌদীআরব। আদ্দুররুল মানছুর, খ.৫, পৃ.৩৮
৩৪. তাফসীরে ইবন কাছীর, খ.৩, পৃ.৩৫০, দারআলামিল কুতুব, রিয়াদ, সৌদীআরব।
৩৫. তাফসীরে কাশ্শাফ, খ.৩, পৃ.২২৮।
৩৬. তাফসীরে কুরতুবী।
৩৭. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৫, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।
৩৮. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৪, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।
৩৯. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।
৪০. আল কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪:২৮।
৪১. তাফসীরে ইবন কাছীর, খ.৩, পৃ.৩৫১, দারআলামিল কুতুব, রিয়াদ, সৌদীআরব।
৪২. আল কুরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯:৫।
৪৩. সহীহুল বুখারী, 'ঘরে প্রবেশের অনুমতি' শীর্ষক অধ্যায়।
৪৪. আবু দাউদ, স. ৪৯৪৩, তিরমিযি, স. ১৯২১।
৪৫. আবু দাউদ, স. ৪৮৪২।
৪৬. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ. ৩২০, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

৪৭. সহীহ মুসলিম, স.২১৬২, দারুল আলাম আল কুতুব, রিয়াদ।

৪৮. আল কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪:২৯।

৪৯. আল কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪:৬১।

৫০. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খ.৩, পৃ.৩৮০, দারআলামিল কুতুব, রিয়াদ, সৌদী আরব। আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ.৩, পৃ.৪৩৪, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবানন।

৫১. আল কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪:২৮।

৫২. আত্তাফসীরুল কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী, খ.২৩, পৃ.২০০।

৫৩. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।

৫৪. সহীহ্ মুসলিম, খ.২, পৃ.২১২, রশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

৫৫. সুনানে আবী দাউদ, খ.২, পৃ.৭০৩, রশীদিয়া লাইব্রেরী, দিল্লী।

৫৬. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ.৩, পৃ.৩৮৫।

৫৭. আল কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪: ৫৮।

৫৮. আবু দাউদ, স. ৪১১২, তিরমিযি, স. ১৭৭৯।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ৪২-৬৫

মদ ও নেশাদ্রব্য প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান

মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম গওহরী

কুরআন ও সুন্নাহ্ যে কোন ধরনের মাদক সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রসূলে আরাবী স.-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এব্যাপারে একমত পোষণ করেন, সব ধরনের মাদক দ্রব্য হারাম এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে এ নিয়ে অদ্যাবধি কোন মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী শরীয়ত যে সমস্ত পানীয় হারাম করেছে, তাকে খামর বলা হয়েছে এবং তা সর্বকালের জন্য শর্তহীনভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে আরব দেশে ধূমপানের ইতিহাস ছিল কিনা তা গবেষণার দাবী রাখে, তবে মদের কথা বলার প্রয়োজন রাখে না। হযরত মুহাম্মদ স.-এর আগমনের পূর্বে আরব দেশে মদের প্রচলন ছিল। তখনকার লোকেরা মদ পান করত। তৎকালীন আরবে মদপান একটা সাধারণ অভ্যাস ছিল এবং মদপানকে অপরাধ মনে করা হতো না। তখন সমগ্র আরব জাতি মদপানকে জীবনের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল। মদপান ছাড়া একটা মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে তা তারা বিশ্বাস করতে পারত না।

হযরত মুহাম্মদ স. মদীনায় হিযরত করার পর মদ হারামের আয়াত নাযিল হয়। মদপান দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। তবে মানুষের এই চিরাচরিত অভ্যাসের পরিবর্তন সাধনে ইসলাম ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছে। একবারে মাদক সেবনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিধানটি মানুষের উপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দেয়নি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুর হতে মদ প্রস্তুত করা হয় এবং উত্তম খাদ্যও।[১]

অতপর, মদ পান করে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[২]

আল্লাহ্ তা'আলা মাতাল হয়ে নামাযে যেতে নিষেধ করেছেন। শুদ্ধভাবে নামায আদায়ের লক্ষে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের মদপান হ্রাস করতে হয়েছে। কারণ মাতাল অবস্থায় সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করা অসম্ভব। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্ তা'আলার এ বিধান পালন করতে গিয়ে মদপান নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন, 'মদের উপকারী ও অপকারী উভয় দিকই রয়েছে। তবে উপকারের তুলনায় অপকারের মাত্রা অত্যধিক।[৩] চূড়ান্তভাবে মদপান নিষিদ্ধ এবং সর্বশেষ নির্দেশ প্রদানের পূর্বেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। মহানবী স. বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সে সব লোককে পছন্দ করেন না যারা মদপান করে। কিছুদিন পর

লেখক : মুহাদ্দিস, জামেয়া মদীনাতুল উলুম, বড়গুনী, বাগেরহাট।

আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন, 'যাদের দখলে মদ রয়েছে তা পান করতে পারবে না এবং বিক্রিও করতে পারবে না। কাজেই তাদের তা ফেলে দিতে হবে। আদেশ প্রদানের পরপরই তা পালনে সকলে তাদের সংগ্রহের মদ মদীনার গলিতে ঢেলে দেয় এবং মদ রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থা দেখে কিছু কিছু লোক মহানবী স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন! আমরা কি তা উপহার স্বরূপ ইহুদীদেরকে দিতে পারি? মহানবী স. উত্তর দিলেন 'যে আল্লাহ্ তাআলা একে (হারাম) বেআইনী করেছেন, তিনি তা উপহার দিতেও নিষেধ করেছেন। অন্যরা জিজ্ঞাসা করলেন! আমরা কি তা সিরকায় রূপান্তর করতে পারি? তিনি উত্তরে বললেন, না। তোমরা অবশ্যই তা ফেলে দাও। অন্য একজন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কি মদ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে অনুমতি পাবে? মহানবী স. তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, না এটা কোন ওষুধ নয়, এটা হলো রোগ। তারপরেও একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা শীত প্রধান এলাকায় বসবাস করি, আমাদের পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। শীতের ঠাণ্ডা দূর করতে, শরীর গরম করতে ও আমাদের ক্লান্তি দূর করতে আমরা মদ্যপান করে থাকি। রসূল স. বললেন, তোমরা যা পান কর তা কি মাতাল করে? লোকটি উত্তর দিল, হ্যাঁ। মহানবী স. উত্তর দিলেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। এতে লোকটি বলল, আমাদের এলাকার লোকজন এই নিষেধাজ্ঞা মানবে না। তিনি উত্তরে বললেন, তারা যদি না মানে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর।[৪]

সকল মুসলমান যখন আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হলো, তখন আল্লাহ্ তাআলা চিরকালের জন্য মদ্যপান হারাম (বেআইনী) ঘোষণা করলেন: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজারবেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণ্য ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার দ্বারা শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়, আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?[৫]

হাদীসে মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ স.-এর অসংখ্য হাদীসে মদ পানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও তার অপকারিতার কথা উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

* প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিস হচ্ছে মদ এবং প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।[৬]
* নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু মাদক দ্রব্য এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু হারাম।[৭]
* যে পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম।[৮]
* যে জিনিস অধিক পরিমাণ (পান করলে) নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম।[৯]

* সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তা এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।[১০]
* রসূলুল্লাহ স. নেশা উদ্রেককারী এবং নেশার প্রতি আকৃষ্টকারী প্রত্যেক বস্তু সেবন নিষিদ্ধ করেছেন।[১১]
* হযরত দায়লাম হিময়ারী রা. বলেন, আমি রসূলে কারীম স.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল স.! আমরা শীত প্রধান এলাকায় বাস করি এবং কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আমাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য ও শীতের প্রকোপ থেকে কিছুটা স্বস্তির জন্য গম হতে প্রস্তুতকৃত শরাব পান করে থাকি। রসূল স. জিজ্ঞাসা করলেন, এতে নেশার সৃষ্টি হয় কি? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তা পরিহার কর। আমি বললাম, কিন্তু লোকেরা তো তা পরিহার করতে চাইবে না। তিনি বললেন, তারা তা পরিহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।[১২]
* তোমার সম্প্রদায়কে অবহিত করবে যে, নেশা উদ্রেককারী সব জিনিস হারাম।[১৩]

মাদক দ্রব্যের সংগা

যে সব বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অথবা চিন্তা শক্তির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদক দ্রব্য বলে।

* যে সব বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং যা সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায় এর সব শ্রেণীই মাদকের অন্তর্ভুক্ত।

মাদক দ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ 'খামর' তার অর্থ আচ্ছন্ন করা, ঢেকে দেয়া, কোনও বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে ক্ষতির কারণ হওয়া। এসব অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই মদ বা শরাবকে খামর বলা হয়।[১৪] খামর শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

মাদকের রকমফের

হিদায়ার ভাষ্যমতে মদ চার প্রকার

১. মদ: আঙ্গুরের কাঁচা রস উথলানোর পর যখন তা ফেঁপে ওঠে এবং যখন তাতে ফেনা সৃষ্টি হয় তখন তাকে খামর বলা হয়।
২. আঙ্গুরের কাঁচা রস পাকানোর পর যদি দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যায় তবে একে 'তিলা' বলে।
৩. 'নাকীউত তামার' একে 'সাকার'ও বলা হয় অর্থাৎ পাকা শুকনা খেজুরের শরাব যা পানিতে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়।
৪. নাকীউয যাবীর অর্থাৎ শুকনা কিসমিস কয়েকদিন পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যখন তাতে ভাপ সৃষ্টি হয় তখন একে নাকীউব যাবীর বলে।[১৫]

মাদকের ব্যাপারে দশ কথা

প্রথম কথা : মদ হলো আঙ্গুরের কাঁচা রস যা নেশা সৃষ্টি করে। আমাদের মাযহাবের ইমাম এবং অভিধান শাস্ত্রের পণ্ডিত লোকদেরও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত এটিই। কিন্তু অনেকের মতে, নেশা সৃষ্টি করে এ জাতীয় সব কিছুকেই খামর বলা হয়।

দ্বিতীয় কথা : খামর নামটি কখন প্রযোজ্য? ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, অঙ্গুরের কাঁচা রস উথলানোর পর যখন তা ফুলে ওঠে এবং যখন তাতে ফেনা সৃষ্টি হয় তখন একে খামর বলে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে উথলানোর পর যখন তা ফুলে ওঠে তখনই তা খামর রূপে গণ্য হবে, ফেনা ওঠা শর্ত নয়। কারণ, এতটুকুর দ্বারাই (মদ নামকরণ) সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয় কথা : মূলত খামর হারাম, এ হুকুম নেশা সৃষ্টিকারী হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং এর ওপর তা নির্ভরশীলও নয়।

চতুর্থ কথা : খামর পেশাবের ন্যায় গুরু নাপাক। এর নাপাকী অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত।

পঞ্চম কথা : কেউ যদি খামরকে হালাল মনে করে তবে অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করার কারণে তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে।

ষষ্ঠ কথা : মুসলিম ব্যক্তির জন্য খামর কোন মূল্যবান বস্তু বিবেচিত নয়। কাজেই কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি খামর নষ্ট করে বা আত্মসাৎ করে, এজন্য তার ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কোন মুসলমান খামর ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে না।

সপ্তম কথা : মদের দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম।

অষ্টম কথা : মদ্যপায়ী ব্যক্তির ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে; যদিও তা নেশা সৃষ্টিকারী না হয়।

নবম কথা : পাকানোর কারণে খামর এর মধ্যে কোন রূপ প্রভাব পড়বে না। কেননা পাকানোর বিষয়টি হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। তবে কাঁচা ও পাকানো রসের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পাকানোর পর ফকীহগণের মতে নেশা সৃষ্টিকারী না হওয়া পর্যন্ত পানকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ (দন্ড) ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে কাঁচা রসের মদ স্বল্প পরিমাণ পান করলেও হদ্দ ওয়াজিব হবে।

দশম কথা : খামর দিয়ে সিরকা বানানো জায়েয। কিন্তু ইমাম শাফিঈ র.-এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।[১৬]

খামর শব্দটি দ্বারা মূলগতভাবে মাদককে বুঝায়। এটি ঐ সমস্ত সুরার সার নির্যাসের (Liquors) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা গম, বার্লি, আলু, খেজুর ও মধু থেকে তৈরি হয়। মহানবী স. সমস্ত মাতালকারী জিনিস হারাম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতিটি নেশাসৃষ্টিকারী জিনিসই মদ এবং তা বেআইনী! অর্থাৎ যে সমস্ত পানীয় মাতাল করে তাই নিষিদ্ধ। শুক্রবারে জুমআর খুৎবায় হযরত খলীফা উমর রা. বলেন, মানুষের চিন্তা করার অংগ যে সমস্ত জিনিস অক্ষম করে দেয় তাই খামর।[১৭]

বাংলাদেশে ব্যবহৃত মাদক দ্রব্য

মদ, গাঁজা, তাড়ি, ভাঙ, চরস, হাশিশ, আফিম, কোকেন, হিরোইন, মারিজুয়ানা, মরফিন, প্যাথেডিন, হালুসি নোসেন্স (এলএসডি, পিসিপি) ডাইলুডিড, ফেনসিডিল, কোডিন, ইয়াবা ইত্যাদি যেকোন নেশা জাতীয় জিনিস মদের মধ্যে শামিল। উল্লেখিত প্রতিটি জিনিস জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে দেয় এবং নেশা সৃষ্টি করে। অতএব এগুলো সবই হারাম।[১৮]

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কোন্ বস্তু খেলে মানুষের উপকার হবে আর কোন বস্তু খেলে মানুষের অপকার হবে তা তিনি সম্যক অবহিত। তাই তিনি দয়া পরবশ হয়ে মানুষের জন্য খাদ্য তালিকা প্রদান করেছেন। যা যা মানুষের দেহের জন্য পুষ্টিকর ও কল্যাণকর এবং যাতে ভিটামিন ও প্রোটিন বিদ্যমান এমন ধরনের হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খেতে বলেছেন, হালাল করে দিয়েছেন। কিন্তু যেসব বস্তু মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং যার মধ্যে ভিটামিন বা শরীরের পুষ্টির বস্তু নেই, যেটা খেলে মানব দেহের প্রচুর ক্ষতি হবে, বিপদ ডেকে আনবে, তিনি তা হারাম (বেআইনী) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। মাদক দ্রব্যের মধ্যে মানুষের সমূহ ক্ষতির কারণ থাকায় এটাকে খুব জোরালোভাবে, কঠোর ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ হারাম ঘোষিত হওয়ায় মদের অপকারিতা যে জঘন্য তা সবাই জানে। সে অপকারিতা মানুষের চোখে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক এবং মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মানুষ তা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছুই যায় আসে না, আল্লাহ্ তাআলা যে জিনিস হারাম করেছেন তার মধ্যে অবশ্যই মানুষের জন্য অপকার নিহিত রয়েছে।

মদের কয়েকটি ক্ষতির বর্ণনা

* মদ মানুষকে নামায, রোযা কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণসহ বহু ইবাদত থেকে বিরত রাখে।
* মাদক দ্রব্য সেবনকারীর জন্য পরকালে কঠোর শাস্তির রয়েছে।
* রসূলুল্লাহ স. তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।
* মদ্যপ বেহেশতে যাবে না (তওবা না করলে),
* শয়তান তাদের দিয়ে অপকর্ম করায়।
* মদ ও ঈমান একত্রিত হয় না।
* ইসলামী আইনে মদ্যপায়ীদের শাস্তি ৮০ কোড়া। এছাড়া পরপারে আরো কঠিন শাস্তির বিধান আছে।
* তাদের হযম শক্তি কমে যায়,

* এসিডিটি বেড়ে যায়,
* খাবারে অরুচি দেখা দেয়,
* শরীর শুকিয়ে যায়,
* ওজন কমে যায়,
* যক্ষা রোগ হয়,
* কিডনী ও লিভার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়,
* বার্ধক্য তরান্বিত করে।
* স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে,
* দেহে শক্তি কমে যায়,
* জন্ডিস, হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ হয়। স্মরণ শক্তি ও ইচ্ছা শক্তি লোপ পায়, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়, আলসার হয়, চর্মরোগ হয়। সর্বোপরি মাদক সেবনকারী হৃদরোগসহ জটিল ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এক কথায় মাদকদ্রব্য মানুষের ধর্মীয় ক্ষতি, দৈহিক ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি, বিবেক-বুদ্ধির ক্ষতি, বংশের ক্ষতি ও সামাজিক ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

সর্বনাসা মাদকের বিস্তার

একদশক পূর্বে ১৯৯৩ সালে বিশ্বের শিশুদের ওপর জরিপ চালিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল, সে প্রতিবেদনে মদ ও মাদক দ্রব্য ব্যবহারে বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি ছিন্নমূল শিশু সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো বিরাট সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ছিন্নমূল শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোননা কোন নেশা বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে।

গোটা বিশ্বের ১০টি নগরীতে পরিচালিত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রণীত এ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, কানাডায় ও মন্ট্রিলের প্রায় একশ ভাগ ছিন্নমূল শিশু মাদকাসক্ত। 'হু' পরিচালিত এ ধরনের জরিপ এটাই প্রথম। রিওডিজেনিরো, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, টেগুসিগালপা, মন্ট্রিল, টরেন্টো, ম্যানিলা, বোম্বে, মেক্সিকো সিটি ও লুসাকা এই ১০টি নগরীর ৫শ' ৫০ জনেরও বেশি শিশুকে এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত ১০টি নগরীর সব কটিতেই শিশুরা মদ, তামাক, গাঁজা, গ্লু দ্রাবক পদার্থ ও ওষুধের মত সস্তা, সহজলভ্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। এসব শিশুর একটি অংশ কোকেন, হেরোইন ও শিরার মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও রপ্ত করেছে।[১৯]

বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সমস্যা। মাদক দ্রব্যের বিস্তারের ফলে বিভিন্ন দেশে অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশেও মাদকাসক্তি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। সম্প্রতি দেশব্যাপি পরিচালিত এক জরিপে

দেখা গেছে, দেশের জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ অর্থাৎ ২৮ লাখ লোক বিভিন্ন রকমের মাদক দ্রব্য সেবন করে থাকে। তবে বাস্তবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। এর মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় গাঁজা, ফেনসিডিল, হিরোইন, সিডাকসিন ও ইনোকটিন জাতীয় ঘুমের ওষুধ। এছাড়া আরো অনেক ধরনের কেমিক্যাল স্পিরিটও একশ্রেণীর লোক মাদক হিসেবে সেবন করে। ফলে প্রায়ই মৃত্যুর ঘটনার খবর শোনা যায়। মাদকদ্রব্য পাচারের কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের অপরাধ। এ অপরাধ প্রবণতা সামাজিক জীবনে মারাত্মক অস্থিরতা সৃষ্টি করছে এবং যুবসমাজকে বিপথগামী করছে। যুবসমাজ বিপথগামীর ফলে জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সহিংসতা, সন্ত্রাস, মাস্তানি, চাদাবাজী, হাইজ্যাক ও জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদিতা। বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, লুটতরাজ, ডাকাতি ও পকেট মারের মত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ।[২০]

বর্তমানে দেশী বিদেশী মদ, সিগারেট, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজার নেশা গ্রাস করেছে তরুণ সমাজকে। গ্রামে কিংবা শহরে সবখানেই একশ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী মাদক সেবনের আসর জমায়। ভণ্ডপীর-ফকিরদের আস্তানায় তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ ও চেলারা নেশার আসর জমায় এক প্রকার প্রকাশ্য স্থানেই।

মদের ব্যবসা ও উৎপাদন সম্পর্কে ইসলাম

নবী করীম স. মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে: মদ্যপায়ী, উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, বহনকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, মূল্য গ্রহণকারী, সেই মূল্য ভক্ষণকারী, ক্রেতা ও যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়। এসকল শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপ।[২১]

মদ পানের সমস্ত পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করাও নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে লোক (ক্ষেতের) আঙ্গুরের ফসল কেটে তা জমা করে রাখে কোন ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে মদ তৈরি করবে, তাহলে সে জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিল।[২২]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোন অমুসলিম ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানের তাল গাছ অর্থের বিনিময়ে (এমনকি বিনিময় ছাড়াও) নিতে চায়, যে ঐ গাছের রস দিয়ে সে তাড়ি তৈরি করবে, তবে ঐ গাছ ঐ ব্যক্তিকে দেয়া বৈধ হবে না। খেজুর গাছের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যা পান করা হারাম তা বেচা-কেনা ও তার মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম।[২৩]

ফকীহগণের মতে মুসলিম দেশে অমুসলিমদেরকে প্রকাশ্যে মদের ব্যবসার অনুমতি দেয়া এবং এর সুযোগ প্রদান করা জায়েজ নয়।[২৪]

মিসরের মুফতী শায়খ আবদুল মজীদ সলীম র.-কে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি হবে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন, চেতনা নাশক দ্রব্যাদির লেনদেন, চেতনা নাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা, উৎপাদন করা ইত্যাদি এবং এ ব্যবসা থেকে লব্ধ অর্থের অবস্থা কি?

মুফতী আবদুল মাজীদ র. এর জবাবে বলেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, চেতনা নাশক দ্রব্যাদির লেনদেন হারাম। কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি এবং বহুবিধ ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ সকল দ্রব্যাদি জ্ঞান ধ্বংস করে, শরীর বিনষ্ট করে। কাজেই শরীয়ত এসব দ্রব্যাদির লেনদেনের অনুমোদন দিতে পারে না। এছাড়া এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। আর এ কারণেই কোন কোন হানাফী আলেম বলেন, যে ব্যক্তি ভাঙকে হালাল বলে সে ধর্মত্যাগী ও বিদআতী।[২৫]

চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম, এতে আল্লাহ্ তাআলার নাফারমানীমূলক কাজে সহায়তা করা হয়। আর এ সহায়তা হারাম। মাদক দ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে ভাঙ, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করাও সম্পূর্ণ রূপে হারাম আর এসব দ্রব্য থেকে লব্ধ অর্থও হারাম ও অবৈধ।[২৬]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন।[২৭]

মদ উপহার দেয়া

মদ পান করা, মদ বিক্রি করা, তার মূল্য ভক্ষণ করা যেমন হারাম অনুরূপভাবে উপঢৌকন হিসেবে কাউকে দেয়াও হারাম, এতে হারাম বস্তুর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। এতে পাপ কাজে সাহায্য করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে না।[২৮]

মুসলমান পবিত্র, তারা অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করতে বা কাউকে উপহার দিতে পারে না। জনৈক ব্যক্তি মদের পিয়ালা হাদিয়া দিতে চাইলে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তাআলা মদকে হারাম করেছেন। লোকটি বলল, আমি তা বিক্রি করে দিই? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তাআলা মদ পান করার পাত্র বিক্রি করাও হারাম করে দিয়েছেন। তখন লোকটি বলল, তবে কোন ইহুদীকে হাদিয়া দিই? রসূলুল্লাহ স. বলেন, যিনি পান করাকে হারাম করেছেন তিনিই ইহুদীকে হাদিয়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন লোকটি বলল, তাহলে তা দিয়ে আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, বাতহা-তে তা ফেলে দাও।[২৯]

এ্যালকোহল বা স্পিরিট মিশ্রিত দ্রব্য

বর্তমানে ওষুধ, আতর ও আরো বিভিন্ন জিনিসের সাথে এ্যালকোহল ও স্পিরিট মিশানো হয়। এসব স্পিরিট ও এ্যালকোহল যদি খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে তবে তা হারাম

হবে আর যদি অন্য কোন পদার্থ দ্বারা তৈরী করা হয় তবে তা হালাল হবে এবং তা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এতে নেশা করা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান প্রচলিত এ্যালকোহল ও স্পিরিট খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা তৈরী করা হয় না। সে মতে এসব এ্যালকোহল ও স্পিরিট ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা শরীয়ত সম্মত।[৩০]

নেশাগ্রস্ত লোকের কথা এবং তাদের কাজের শরয়ী বিধান

মাতাল অবস্থায় মদপানের কথা স্বীকার করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। এ ব্যাপারে সকল ফকীহগণ একমত পোষণ করেন, তবে সে যদি চুরি করার কথা স্বীকার করে তবে তাকে জরিমানা করা হবে। সে ব্যক্তি যদি যিনা ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। আবার মাতাল অবস্থায় যিনা করলে যদি তা সাক্ষী সাপেক্ষে প্রমাণিত হয় তবে তার ওপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। এর কারণ হিসেবে ফকীহগণ বলেন, যেহেতু সে হক্কুল ইবাদ নষ্ট করেছে, তাই মাতাল অবস্থায় একথা স্বীকার করলেও দণ্ড যোগ্য হবে। মাতাল অবস্থায় কারো উপর অপবাদ আরোপের কথা প্রমাণিত হলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে দণ্ড জারী করা হবে। তালাক, দাসমুক্তি, কিসাস, দিয়াত এবং আর্থিক অধিকার এর ব্যাপারে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, তবে মাতাল অবস্থায় ধর্মত্যাগ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩১]

জীবন বাঁচানোর জন্য মদ পান

চরম ক্ষুধা ও পিপাসার্ত অবস্থায় পানাহারের জন্য মদ ভিন্ন কোন কিছুই না পাওয়া গেলে, জীবন নাশের আশংকা হলে জীবন রক্ষার্থে মদ পান করা জায়েয। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকরের মাংস খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। মদের বিষয়টিও অনুরূপ। তাই এরূপ অবস্থায় পড়লে মদপান করাও জায়েয হবে, তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘনকারীদের অনুরূপ আচরণের অনুমতি নেই। এ অবস্থা কেটে গেলেই পূর্ববৎ তা হারাম হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা রোগ ও তার প্রতিষেধক উভয়টি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সর্ব প্রকারের রোগের জন্যই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা রেখেছেন। সুতরাং রুগ্ন অবস্থায় তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে, কিন্তু হারাম বস্তুকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করবে না।[৩৩]

কয়েকটি মাদক দ্রব্যের পরিচয় ও বিধান

পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন নেশার বস্তু হচ্ছে আফিম, পপি নামক উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও ফুলের নির্যাস থেকে তৈরি বেদনানাশক মাদক দ্রব্য। আফিম মুখে খাওয়া যায়, ধুমপানে ব্যবহার করা যায়। এ পদার্থটি তাপের সাহায্যে পানিতে দ্রবণীয় এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া গাঢ় কাল আফিমের গুল্লি দুধ বা মধু যোগে সেবন করা যায়।

মরফিন : আফিম থেকেই মরফিন উদ্ভুত এবং গত এক শতাব্দি ধরে এটা একটা বেদনা নাশক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা ইনজেকশনের জন্য সলিউশন আকারে পাওয়া যায় এবং টেবলেট ও সাপোজিটরী আকারেও পাওয়া যায়।

হেরোইন : আফিম ও মরফিনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন মাদক হেরোইন। বিশুদ্ধ অবস্থায় হেরোইন স্ফটিক জাতীয় সাদা বা বাদামী রংয়ের এক ধরনের পাউডার। এর স্বাদ তেতো। এ পাউডার এত বেশি মিহি যে হাতের আঙ্গুলে ঘসলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আফিম ও মরফিনের প্রতিষেধক রূপে হেরোইনের আবিষ্কার কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে এটি ভয়ঙ্কর নেশা জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয়, যা ধুম পানের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হেরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া হয়। তাছাড়া হেরোইন পাউডার ইনজেকশান হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ভাঙ ও গাঁজা : এক প্রকার পাতা যা দ্বারা নেশা করা হয়। এগুলো তামাকের ন্যায় ধুমপানের মাধ্যমে সেবন করা হয়।

পেথিড্রিন : এটা বেদনা নাশক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম মাদক। সাধারণত এটা ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

ফেনসিডিল : এটি একটি কাশির ঔষধ। এতে রয়েছে আফিম জাতীয় দ্রব্য কোডিন ফসফেট। এই ঔষধ বাংলাদেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ। আমদানী রফতানী, ক্রয়-বিক্রয়, সব নিষিদ্ধ।

হাশীশ : এক প্রকার উদ্ভিদ। যা থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য তৈরী করা হয়। কোন কোন ফকীহ বলেন, কানাবে হিন্দী গাছের পাতা থেকে তৈরী মাদক দ্রব্যকে হাশীশ বলে। আল্লামা শামীর মতে ভাঙ, হাশীশ, আফিম, ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হারাম। এতে মানুষের বিবেক-বিবেচনাশক্তি লোপ পায় এবং এগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উদাসীন করে রাখে। তবে এগুলো হুকুমের দিক থেকে মদ থেকে নিম্নমানের। কাজেই এ জাতীয় মাদক দ্রব্য পান করলে সামাজিকভাবে সাজা দেয়া হবে। হদ্দ জারী করা যাবে না। কেউ ভাঙ ও হাশীশকে হালাল মনে করলে সে হবে ধর্মত্যাগী, জিন্দীক ও বিদআতী। আল্লামা ইবনে হাজার র. বলেন, হাশীশ সেবন করা দীনী ও দুনিয়াবী উভয় দিক থেকে ক্ষতিকর। এমনকি তিনি একশত বিশ প্রকারের ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, হাশীশকে কেউ হালাল জ্ঞান করলে কুফরীর অন্ত র্গত হবে।[৩৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. হাশীশ সম্বন্ধে বলেন, হাশীশ সেবন করা হারাম। এর দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়, স্বাস্থ্যহানী ঘটে এবং এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। তাঁর মতে, হাশীশ পান করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং শয়তান খুশি হয়, আখলাক-চরিত্র ধ্বংস হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এমনকি পরিণামে এ জাতীয় মানুষ মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পাগল হয়ে যায়।[৩৪ক] আল্লামা ইবনে কাইয়েম র.ও তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। হেরোইন, হাশীশ, ভাঙ, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের চাষাবাদ, আমদানী-রফতানী, চোরাচালানী সবই ফকীহ গণের মতে হারাম। কেননা এর দ্বারা হারাম কাজে সহযোগিতা করা হয়, অথচ কুরআন শরীফে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না।'[৩৫]
অধিকন্তু এ সব মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ এবং আমদানীতে পাপের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি এবং স্বতস্ফূর্ত সমর্থন বুঝা যায়। অথচ গুনাহের কাজের প্রতি সন্তুষ্টিও গুনাহ। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, গর্হিত কাজকে যদি কেউ হৃদয় দিয়ে অপছন্দ না করে তবে তার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই।[৩৬]

মদ ওষুধ নয় বরং রোগ

মদ ওষুধ হিসেবে সেবন করাও জায়েয নয়। কারণ মদ প্রকৃতপক্ষে ওষুধ নয়। রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেছিলেন, মদ মূলত কোন ওষুধই নয় বরং তা হচ্ছে ব্যাধি।[৩৬ক] অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা রোগ-ব্যাধি ও তার ওষুধ উভয়ই নাযিল করেছেন। তোমাদের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। অতএব, তোমরা চিকিৎসা করবে, তবে হারাম জিনিস দ্বারা নয়।
মদ ও মাদক দ্রব্য সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, যেসব জিনিস তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে আল্লাহ তাতে তোমাদের কোন রোগের নিরাময় রাখেননি।
'হারাম জিনিস তথা মাদক দ্রব্য ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম'! এতে বিস্ময়কর কিছু নেই। কেননা কোন জিনিসকে হারাম করার অর্থ হচ্ছে তা থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য। এ অবস্থায় যদি এর দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে হারাম ঘোষণা করার বিষয়টি নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আল্লামা ইবনে কাইয়েম র. এ সম্পর্কে বলেন, হারাম জিনিস ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হলে তার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এহেন অবস্থায় হারাম ঘোষণার কথাটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।[৩৭]

ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির প্রতি অতিশয় দয়ালু। তাই তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর জিনিসগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। বিষ বা প্রাণনাশক দ্রব্যকে এজন্যই হারাম

করা হয়েছে। প্রাণ সংহার করা এবং যে যে কাজে প্রাণ সংহার হয় তা ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[৩৮] অপর এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না।[৩৯]

রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, নিজে ক্ষতির শিকার হবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষতিকর সমস্ত বস্তুই হারাম। তা ধর্মীয়, আর্থিক, শারীরিক, সামাজিক তথা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।[৪০]

সেবন ছাড়া অন্য কাজে মদ ব্যবহার

মদ পান যেমন হারাম অনুরূপভাবে পান করা ছাড়া অন্য কাজে মদ ব্যবহার করাও হারাম। বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরকে ওষুধস্বরূপ মদ পান করানো নাজায়েয। এরূপ করলে যে পান করায় সে পাপী হবে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের সন্তান ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতএব তাদেরকে তোমরা মদ দ্বারা চিকিৎসা করাবে না এবং তাদেরকে তা খাওয়াবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা নাপাক বস্তুতে প্রতিষেধক রাখেননি। শরীরের ক্ষত স্থানে মদ ব্যবহার করা যাবে না। কোন প্রাণীর চিকিৎসায়ও ওষুধ রূপে মদ ব্যবহার করা যাবে না। মদের দ্বারা ডুস গ্রহণ এবং জননেন্দ্রীয়ের ছিদ্রে তা ব্যবহার করা যাবে না। পশু মোটাতাজা করণেও মদ ব্যবহার হারাম।[৪১]

মদ্য পান সকল অপরাধ ও পাপ কাজের উৎস, এ প্রসঙ্গে রসূলুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, মদ্য পান সকল অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহের উৎস।[৪২]

মদ বা এ জাতীয় হারাম বস্তু ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে ফিকহবিদদের অভিমত হচ্ছে, প্রাণ নাশের আশংকা ছাড়া ভিন্ন কোন ওষুধ না থাকলে সে ক্ষেত্রে ব্যবহার বিধেয়। তবে সাধারণ চিকিৎসায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ র. বলেন, যদি কোন বিজ্ঞ স্পেশালিস্ট ডাক্তার বলেন, মদ থেকে প্রস্তুতকৃত ওষুধ ছাড়া তার রোগ নিরাময় অসম্ভব, তাহলে কেবল তার জন্য এই হারাম ওষুধ ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয।[৪৩]

উপরোক্ত বিষয়ে মাদক দ্রব্য ও মদের হুকুম একই, যে যে অবস্থায় মদের ব্যবহার হারাম মাদক দ্রব্যও সে সে ক্ষেত্রে হারাম, আর যে যে ক্ষেত্রে মদের ব্যবহার জায়েয সে সে ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও জায়েয।

পার্টি-ক্লাব বা যেখানে মদের আসর হয় সেখানে যোগ না দেয়া

মদ্যপায়ীদের মদ পানের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, সেখানে যাওয়া-আসা হারাম। হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে তারা এমন

কোন অনুষ্ঠানে বা ঘরে একত্রিত হবে না যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। অপরদিকে সকল মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে যে তারা গর্হিত কাজ হতে দেখলে বন্ধ করার চেষ্টা করবে, তা না পারলে সেখানে যোগ দিবে না। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয র. মদ্যপায়ীদের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকেও দোররা মারতেন। একবার তার নিকট কতিপয় লোককে গ্রেফতার করে আনা হল। তাদের বিচার করার আদেশ দিলে কেউ বলল, এদের মধ্যে রোযাদার ব্যক্তিও আছে? উত্তরে তিনি বললেন, তাকে তো প্রথমেই শাস্তি দেয়া উচিত। কারণ তোমরা কি আল্লাহ তাআলার বাণী শোননি, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ তাআলার আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে?'[৪৪]

মাদক পাপের উৎস

জনৈক আরব কবি মাদক দ্রব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে কবিতার ভাষায় বলেন,

'আমি মদ্যপ হয়ে দেখেছি
আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে
আর সকল মাদকই মানুষের
বিবেক বুদ্ধির সাথে এরূপ আচরণ করেছে।'

মানুষের স্বাভাবিক বিচার ক্ষমতা লোপ পেলে তখন কোনটা ক্ষতিকর আর কোনটা কল্যাণকর তা পার্থক্য করতে পারে না। তখন কর্তব্য জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। ন্যায় অন্যায় বোধও। আকৃতিতে মানুষ থাকলেও বিবেক বিবেচনায় সে পশু হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিজনেস পার্টনারসহ কাছের লোকদের বিনা দ্বিধায় সে হত্যা করতে পারে, যিনা ব্যভিচারের মত অপরাধ করতেও তার আত্মা কেঁপে ওঠে না। এজন্যই হযরত উসমান রা. বলেছেন, 'তোমরা সকলে সর্ব প্রকার মাদক পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে, সর্বপ্রকার পাপ কাজের উৎস। হযরত উসমান রা. জনৈক মদ্যপের অনিষ্টতা ও অপকর্মের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন: পূর্বে এমন নেক লোক ছিল যে তখন সে ইবাদত বন্দেগী করত। তারপর একজন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করতে মনস্থির করলো। তখন সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি মহিলার ঘরে প্রবেশ করলে সে দরোজা বন্ধ করে দিল। একজন সুন্দরী মহিলা, একটি সুদর্শন বালক ও এক পেয়ালা মদ দেখিয়ে মহিলাটি বলল, আমি তিনটি প্রস্তাব করব, তার কোন একটা গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই। হয় এই সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে হবে, নয় এই সুদর্শন বালককে হত্যা করতে হবে আর না হয় মদ পান করতে হবে। লোকটি ভেবে দেখল তিনটি অপরাধের মধ্যে মদ পান অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। অতএব লোকটি মদ পান করার সিদ্ধান্ত নিল। অত:পর সে বলল, আমাকে মদ দাও। তখন তাকে মদ পান করতে দেয়া হল। সে অধিক পরিমাণ মদ পান

করে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করল এবং এক পর্যায়ে বালকটিকেও হত্যা করল।
এ কাহিনী থেকে বোঝা গেল যে, মদ হচ্ছে সমস্ত পাপের উৎস। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর। আল্লাহর কসম! ঈমান ও মদ পান একত্রিত হতে পারে না। হয়তো ঈমান থাকবে আর না হয় থাকবে শুধু মদ।[৪৫]
ইমাম কুরতুবী র. বলেন, মদ্যপায়ী সচেতন মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হয়। অনেক সময় মদ্যপ মল-মূত্র নিয়ে খেলা করে, তা হাতে মুখে মাথায় মাখতে থাকে, মদ পানের দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়ে যায়।[৪৬]
বস্তুত মানুষ মাদকের প্রভাবের মতো আর কিছুতে এতো প্রভাবিত হয় না। অনুসন্ধানে পাওয়া যায় মদ্যপায়ীরা অধিক হারে পাগল হয়। স্নায়ুবিক ও পেটের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা স্বাভাবিকভাবে হয় না। মদ্যপায়ী সর্বহারা হতে বাধ্য। ঘরের মূল্যবান জিনিস-পত্র , স্ত্রীর মহামূল্যবান অলংকারাদি ও মূল্যবান তৈজসপত্র পানির দরে বিক্রি করে দিয়েও মাদক দ্রব্য কিনতে বাধ্য হয়।[৪৭]

পাশ্চাত্য ও মাদক

বর্তমানে উন্নত বিশ্ব মাদক সেবনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তিত। এ নিয়ে গবেষকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশে মাদকসেবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে জ্ঞানী লোকেরা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। গবেষণা করে তারা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হলো, এখন গোটা বিশ্বে সব ধরনের মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হলে এর বিরোধিতা করার মত উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবন্ধকতা সামনে এসে দাঁড়াবে না। পক্ষান্তরে আজ থেকে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলাম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে এ যুগের বিজ্ঞানীরাও তা বিনা বাক্যে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।
ইসলাম মদ নিষিদ্ধ করেছিল সপ্তম শতাব্দীতে। তখন ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও মদ বা মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হয়নি। তখন অনৈসলামী বিশ্ব এটাকে বাড়াবাড়ি বলে এড়িয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে মদের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছিল। অমুসলিম দেশসমূহে খোলা বাজারে মাদক দ্রব্য বিক্রি ও সেবন এখনও চলছে। তবে বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে বৈজ্ঞানিকরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মাদক সেবনে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শরীর ও সম্পদ নষ্ট ছাড়া মাদকে আর কোন উপকারিতা নেই। বিশ্বের বহু দেশে মাদক বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। দেশে দেশে মাদক সংশ্লিষ্ট রোগ নিরাময়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে।

অমুসলিমদের মাদক প্রীতি ও আইনী পৃষ্ঠপোষকতা

মাদক বিরোধী আন্দোলন বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। মাদক বিরোধী আন্দোলন গোটা বিশ্বে শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নেয়ার কারণে বিশ্বের বহু দেশ মাদক সেবনের

বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছে। সরকারী, বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বহুবিধ কর্মতৎপরতা চলছে। সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিজ্ঞাপন, স্টিকার ইত্যাকার নানাবিধ পদ্ধতিতে জোরালোভাবে প্রচার চলছে। কিছু কিছু দেশ মাদক দ্রব্যকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আর কিছু দেশ আংশিক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। পাবলিক চলাচলের পথে, খোলা বাজারে, শিশু কিশোরদের কাছে মাদক বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। বিশ্বের অনেক দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে মাদক সেবনের অনুমতি রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে একমত হয়েছেন। বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম অর্থাৎ সংবাদপত্র, টিভি, রেডিওসহ্ সমস্ত প্রকার প্রাচার মাধ্যম কম বেশি মাদক বিরোধী শ্লোগানে সরব। মাদক বিরোধী প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিশ্ব মানবের অন্তরে মাদক বিরোধী চেতনা তৈরি হচ্ছে। ফলে জনগণ প্রকাশ্যে মাদক বেচা কেনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক দেশেই এ শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে, 'মাদককে না বলুন'। এ সমস্ত সংস্থা ও সংগঠনকে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত, বুদ্ধি, পরামর্শ, সময় দিয়ে, এমন কি অর্থ দিয়েও সাহায্য করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন গোটা বিশ্বজুড়ে মাদক বিরোধী শ্লোগান একই সুরে উচ্চারিত হবে, একই সাথে মাদক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। গত প্রায় পনের শ' বছর ধরে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান 'সব ধরনের মাদক দ্রব্য হারাম' এই আদর্শিক বাণী যারা মানতে রাজী ছিল না, তারাই আজ গোটা বিশ্বে সবচেয়ে জোরে শোরে সোচ্চার কণ্ঠে মাদক বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

মাদক ও যুব সমাজ

প্রায়ই অভিভাবকগণ যুবক সন্তানদের নিয়ে টেনশন ফিল করেন। তার কলিজার টুকরা কখন জানি মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে! সাধারণত অভিভাবকের মাদক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে সন্তানদেরকে এর অপকারিতা ও ক্ষতির দিকটা বুঝাতে পারে না। আবার কেউ কেউ ভাবেন যৌবনে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়! তবে তারা জানেন না যে, একবার ঝুঁকে পড়লে তা থেকে বিরত রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং আসক্ত যুবকটি তখন পরিবার ও সমাজের জন্য গুরুতর ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। মাদক সেবনের আসক্তি একটা বড় ধরনের অপরাধ। এর শেষ পরিণতি নির্ঘাত মৃত্যু। তাই শরীয়ত কর্তৃক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে নিজেকে ও সন্তানকে সজাগ রাখতে হবে। প্রত্যেকের উচিত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদকের বিরুদ্ধে ইসলামের আদর্শিক দিকটি যথাযথভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না।

যুব সমাজের মাদকাসক্তির কারণ

অনেকে মনে করেন, যুব সমাজ সাধারণত অস্বাভাবিক কোন ঘটনার ফলে মানসিক টেনশনের কারণে মাদক সেবনে এগিয়ে আসে। এটা একমাত্র কারণ নয়, এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে

পারে। সংক্ষেপে কয়েকটির আলোচনা করা হল। অনেকে স্বল্পকালীন বিষণ্ণতায় আনন্দ পেতে মাদকের আশ্রয় নেয়। মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে উৎসাহী হয়। অনেকে মাদক সেবনে প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা জানতে কৌতূহলী হয়। মাদক সহজলভ্য হওয়ায় বয়সের তাড়নায় আধুনিক হতে অনেকে মাদকে আকৃষ্ট হয়। মিডিয়া জগত এমন অনুষ্ঠান, চলচিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে মদের আসর, মদ পান দেখে নেশাগ্রস্ত হয়ে মাদক সেবনের প্রতিক্রিয়া এক্সপেরিমেন্ট করতে ক্লাব পার্টির আনন্দ উৎসব, ক্রীড়াচ্ছলে মাদক সেবন করে। যুব সমাজের একটি অংশ এভাবে মাদক সেবনে অভ্যস্থ হয় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করছে।

কিশোর ও শিশুদের সাথে মাদক বিষয়ক আলোচনা

শিশু কিশোরদের মন কচি ও কাদামাটির মত, তাতে যা অংকন করা হবে তা সহজে মুছে যায় না। এ কারণেই মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের ইসলামের আদর্শিকতার আলোকে ধারণা দিতে হবে। যদিও এক শ্রেণীর লোকেরা শিশুকিশোরদের সাথে মাদক সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দ করে আসলে তা ঠিক নয়। শিশু কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাদক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

মদ পানের শাস্তি

মদ পান ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহ এবং ফৌজদারী অপরাধ রূপে গণ্য। ফকীহগণ এব্যাপারে একমত যদি কারো মদ পান করার বিষয়টি যথা নিয়মে প্রমাণিত হয় তবে তাকে ৮০ (আশি) দোররা মারা হবে।[৪৮]

মদপান করার বিষয়টি দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। পানকারী ব্যক্তি যদি নিজে স্বীকার করে তবে একবার স্বীকার করলেও তা প্রমাণিত হবে। এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪৯]

সকল ফিকহ্ শাস্ত্রবিদের মতে মদ্যপায়ীকে যথার্থ কতৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব।[৫০]

মদ বা মাদকসেবীর শাস্তি

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির উপর শরীয়তের 'হদ্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া জরুরী:

১. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। পাগলের উপর হদ্দ জারী করা যায় না।
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।
৩. মুসলমান হওয়া। কাফের ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রযোজ্য নয়।
৪. ইচ্ছাপূর্বক সেবনকারী হওয়া। ভুলবশত সেবন করলে বা জোর পূর্বক সেবন করানো হলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।

৫. মুযতার বা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মদ পান করলে তার উপর হদ্দ প্রয়োজ্য হবে না।[৫১]

কোন ব্যক্তি মদ পান করার পর যদি তাকে ধরে আনা হয় আর তার মুখে তখনো মদের গন্ধ অবশিষ্ট থাকে অথবা কাউকে যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হয় এবং সাক্ষীরা তার মদপানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার উপর দণ্ডপ্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে মদ্য পানের স্বীকারোক্তির পর তার মুখে যদি মদের গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তবে তাকেও দণ্ড প্রদান করা হবে, মদের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক এতে কোন পার্থক্য নেই, মুখ থেকে মদের গন্ধ দুর হওয়ার পর মদ্যপানের কথা স্বীকার করলেও তার উপর দণ্ডপ্রয়োগ করা হবে। এমনি ভাবে নেশা এবং দুর্গন্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষীগণ যদি কারো ব্যাপারে মদ পানের সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তার উপরও দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অথবা মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবস্থায় সাক্ষীগণ যদি কাউকে ধরে আনে এবং ঐ স্থান থেকে আদালত পর্যন্ত যেতে যেতে তার মুখের দুগর্ন্ধ দুর হয়ে যায় তাহলেও তাকে দণ্ডপ্রয়োগ করা হবে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজে মদপানের কথা স্বীকার করে তবে এই ভিত্তিতে তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। ফকীহগণ বলেন, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি চেনার উপায় হল:

মাতালের অবস্থা : যদি কোন মদ্যপায়ী আসমান-যমীনের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে; নারী-পুরুষ চিনতে না পারে এবং নিজের কথার তারতম্য করতে না পারে আর অধিকাংশ সময় অহেতকু প্রলাপ বকে তবে তাকে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল মনে করা হবে।[৫২]

যদি সাক্ষীগণ বিচারক এর নিকট কোন ব্যক্তির মদ পান করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তবে বিচারক সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করবেন, মদ কী জিনিস? তারপর জিজ্ঞাসা করবেন সে কিভাবে তা পান করল? কেননা হতে পারে তাকে জোর পূর্বক মদ পান করানো হয়েছে, এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, সে কবে মদ পান করেছে? কারণ এটাতো অনেক আগের ঘটনাও হতে পারে। যদি সাক্ষীগণ এসব ব্যাপারে যথাযথ বিবরণ দিতে পারে তবে বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে রাখবেন। অত:পর তার ন্যায় অন্যায় জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হবেন। বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোন রায় দেয়া যাবে না।[৫৩]

বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক), জ্ঞানবান, বাকশক্তি সম্পন্ন কোন মুসলমান মদ পান করলে তার ব্যাপারে অভিযোগ ও সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে, আর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে। পক্ষান্তরে নাবালিগ, পাগল এবং কাফের ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কোন বোবা ব্যক্তির উপরও দণ্ড প্রদান করা যাবে না। তবে অন্ধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা যাবে।[৫৪]

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলমান মদপান করে যদি বলে মদ পান হারাম সম্পর্কে আমি জ্ঞাত ছিলাম না, একথা বলা সত্ত্বেও তাকে দোররা মারতে হবে। কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে মদপান করেছে তাহলে তার হুশ ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কারো মুখে মদের গন্ধ পেলেই তাকে শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তার

স্বীকারোক্তির পূর্বে অথবা যথাযথ সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতেই কেবল শরয়ী দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে। দুজন সাক্ষীর মধ্যে একজন যদি বলে মদ পান করেছে, আর অপরজন যদি মদ বমি করার কথা বলে তবে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।[৫৫] দুইজন সাক্ষী কারো মদপানের সাক্ষ্য দেয়ার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ নিসৃত হওয়া সত্ত্বেও যদি সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে সময়ের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তার দণ্ড বাতিল হয়ে যাবে। উভয় সাক্ষীর একজন যদি মদ পান করার কথা বলে আর অপরজন যদি বলে যে, সে একথা স্বীকার করেছে তাহলে অভিযুক্তকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। অনুরূপ যদি একজন সাক্ষী বলে যে সে মদের নেশায় আচ্ছন্ন আছে আর দ্বিতীয়জন বলে যে সে অন্য কোন বস্তুর নেশায় আচ্ছন্ন আছে তবে তাকেও দোররা মারা জায়েয হবে না।[৫৬]
কেউ যদি মদকে পানি, দুধ বা অন্য কোন তরল বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করে তবে এক্ষেত্রে মদের পরিমাণ বেশি হলে এক ফোটা পান করলেও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। আর যদি মদের পরিমাণ কম হয় তবুও তা পান করা হালাল হবে না। তবে নেশাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত এজাতীয় পানীয় দ্রব্য পান করলে দণ্ড প্রদান করা যাবে না।[৫৭]
কাউকে জোরপূর্বক মদপান করানো হলে তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না।[৫৮]
মদপান করার কারণে যাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাকে লানত করা, তিরষ্কার করা, ভর্ৎসনা করা জায়েয নয়। হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ স.এর যামানায় মদ পানের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাকে লক্ষ করে এক সাহাবী বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি লানত বর্ষণ করুন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, লানত করো না, সেতো আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালবাসে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, বরং বলো, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি রহম করুন।' এতে একথা প্রমাণ হয় যে, শাস্তি প্রাপ্ত কোন মদ্যপায়ীকে লানত করা জায়েয নয়। এমন কি পাপীকেও তার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে লজ্জা দেয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ।[৫৯]

মাতালের ব্যভিচারজনিত অপরাধ

মাতাল ব্যক্তি কোন নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তা যেনার আওতাভুক্ত হবে। এবং অপরাধী যেনার শাস্তি ভোগ করবে।[৬০]
মদ্যপের জন্য আল্লাহ তাআলা ভয়ানক শাস্তির বিধান করেছেন। জাগতিক আইন শৃংখলার উন্নতির জন্য মদ্যপায়ীকে ৮০টি বেত্রাঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর আখেরাতের শাস্তি আরো ভয়ংকর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একবার মদ পান করল আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায কবুল করবেন না। যদি সে তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে নেন। অত:পর সে যদি দ্বিতীয় বার মদ পান করে তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সে দ্বিতীয় বার অনুতপ্ত

হয়ে যদি প্রথম বারের ন্যায় তওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা দয়া করে দ্বিতীয়বারের মত তার তওবা কুবল করবেন। যদি সে তৃতীয় বার মদ পান করে তবে আল্লাহ তাআলা প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ন্যায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না। যদি সে পুনরায় তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কুবল করেন। কিন্তু যদি সে চুতর্থ বার মদপান করে তবে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য বারের মত চল্লিশ দিন তার নামায কবুল করবেন না। পুনরায় তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন না, উপরন্তু তাকে 'নাহরে খাবাল' তথা দোযখীদের রক্ত পূঁজ পান করাবেন।[৬১] এ ছাড়া আরো বহু হাদীসে মদপান সম্পর্কে সতর্কবানী উচ্চারিত হয়েছে।

নেশা

ইসলামী শরীয়তে যে কোন প্রকার নেশা হারাম। তাতে নেশাগ্রস্ত হওয়া শর্ত নয়। তবে হারামের বিধান জারী করার জন্য মাদক সেবনের নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। অতএব স্বল্প-বেশি যাই হোক, মাতাল হোক বা না হোক মাদক সেবন মাত্রই হারাম। নেশাজাত দ্রব্য মদ ছাড়া ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও বিধান একই। তবে ইমাম আবু হানীফা র. মদ ও নেশাজাত দ্রব্যকে পৃথক করেছেন। তিন বলেন, মদ্য পান সামান্য হলেও শাস্তি যোগ্য তবে মদ ভিন্ন অন্য নেশজাত দ্রব্য সেবনে নেশা না হওয়া পর্যন্ত তার উপর শরয়ী হদ্দ প্রয়োগ হবে না।

ইমাম আবু হানিফা র. আরো বলেন, তাজা আঙ্গুরের রস দীর্ঘদিন রেখে দেয়ায় ঝাঁঝ এসে গেলে, অথবা আঙ্গুরের রস পাকালে তিন ভাগের দুইভাগ কমে গেলে, বা শুকনো খেজুর ভেজানো পানি, বা কিছমিছ ভেজানো পানি পাকানো ছাড়া গাঢ় হয়ে গেলে তা মদের পর্যায়ভুক্ত হবে।[৬২]

আঙ্গুরের রস, কিছমিছ, শুকনো খেজুর গোলানো পানি জ্বালানো ছাড়া তিনের দুই অংশ কমে না গেলে, গম যব, ভূট্টা ইত্যাদি গোলানো পানি বা তা পাকানো হলে নেশাজাতদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এজাতীয় পানীয় পান করারপর নেশাগ্রস্ত মাতাল না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।[৬৩]

যে সমস্ত পানীয় মাদকের মত অনুভূতিহীন করে মাতাল করে যেমন ভাং, ধুতরা, তাড়ী ইত্যাদির বিধান মদের বিধানের অনুরূপ। তবে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মদের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ শরীয়তের শাস্তি মদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট। হদ্দের মত কঠিন শাস্তি কিয়াস করে প্রয়োগ করা যাবে না। অতএব সর্বসম্মতি ক্রমে অনুভূতি নাশক পদার্থের বিধান হল, তা'যীর বা হুশিয়ারী।

মাতালের সংগা

মাদক দ্রব্য সেবনের পর যার বিবেক লোপ পেয়ে যায়, যাকে দেখলেই অস্বাভাবিক মনে হয়, যার কথা বোঝা যায় না, যে নেশাগ্রস্তের নারী-পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, ভাল মন্দ বুঝে না, আসমান যমীন যার কাছে সমান মনে হয় সেই মাতাল। ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এমতটি পাওয়া যায়।[৬৪] তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমামা আবু ইউসুফ র. এর নিকট মাতালের সংগা ভিন্ন।

তারা বলেন, মাতাল বলা হবে ঐ ব্যক্তিকে যার কথায় অকথা, কুকথা, নির্লজ্জতা প্রাধান্য পাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত মাতাল অবস্থায় (মদপান করে) নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের কথা বুঝতে সক্ষম হবে।'[৬৫] এ কারণেই নিজের কথা বুঝতে সক্ষম না হলে তাকে মাতাল বলা হবে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৬৬]

মাতাল সম্পর্কে ফৌজদারী বিধান

ফকীহগণের রায় হচ্ছে, বেহুশ মানুষকে জোর প্রয়োগ করে নেশাজাত দ্রব্য খাইয়ে দিলে, ইচ্ছাকৃত ভাবে পানীয় মনে করে পান করে বা ওষুধ মনে করে পান করে পান করার পর নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ তার অপরাধ করার সময় জ্ঞান ছিল না। জ্ঞানহীন পাগল ও ঘুমন্ত মানুষের অনুরূপ বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তৃষ্ণা নিবারনের জন্য অন্য কোন পানীয় না থাকায় বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে কোন অপরাধ করে ফেললে তার উপর মদ সেবনের কারণে মাতাল হওয়ার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। তবে অপরাধের ধরন হিসেবে ভিন্ন শাস্তি পাবে।

কেউ যদি সেচ্ছায় জ্ঞাতসারে মদ পান করে মাতাল হয় কিংবা বিনা প্রয়োজনে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবন করে মাতাল হয়ে কোন অপরাধ করে অপরাধের প্রকার হিসাবে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে স্বেচ্ছায় জ্ঞান লোপ করে অপরাধ সংঘটিত করেছে। এ জাতীয় অপরাধীদের শাস্তি প্রয়োগ না করা হলে অপরাধীরা বেপরোয়া অপরাধ করেই যাবে। তারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি সহ আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবে। এসব কারণে তাদেরকে অবশ্যই দণ্ড প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয় করতে হবে।

মাতাল সম্পর্কে দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনে চেতনাহীন মাতাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ, জেরা করা হবে তবে মাতাল হওয়ার কারণে শাস্তি প্রয়োগ মুলতবী থাকবে। শরীয়ত মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং মানুষকে সম্মানিত করেছে। তাই শরয়ী অক্ষমতার কারণে জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না। অতএব মাতালের কারণে তার শাস্তি সাময়িক মুলতবি থাকলেও দেওয়ানী জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকবে। তার দ্বারা কারো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম। কোন ফাঁক ফোঁকর দিয়ে একে হালাল করার উপায় নেই। কঠোর পার্থিব শাস্তির তুলনায় আখেরাতে আরো মারাত্মক শাস্তির

কথা বর্ণিত হয়েছে। সব কিছু বিবেচনা করে সর্বশ্রেণীর মানুষকে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, এখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জরুরী। মাদকাসক্তি আমাদের দেশে সর্বনাশা ব্যাধি হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মাদকাসক্তির ব্যাপকতার কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ দুর্যোগ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক বৈষম্য, বাজার অর্থনীতির টানা পোড়েন, রাতারাতি অর্থবৈভবের মালিক হওয়ার নষ্ট প্রবণতার প্রভাব তারুণ্যের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। তারুণ্যের ক্ষয়কে দ্রুত থেকে দ্রুততর করার সহায়ক হিসাবে মাদক, হেরোইন, চরস, ফেনসিডিল সহ বাজারে বহু সর্বনাশা মাদকের ছড়াছড়ি। দেশের অসংখ্য মাদকাসক্ত তরুণ তরুণীদেরকে মাদকাসক্তির অপকারিতা ও শরয়ী নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞাত করতে হবে। এছাড়া মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো যথেষ্ট নয়। দেশ ও সমাজকে মাদক মুক্ত করতে হলে ইসলামী সংগঠন সংস্থা ও কর্মীদের কাজে লাগালে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আল্লাহ পাকের ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি ছাড়া মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির বিকল্প ফলপ্রসূ কোন পথ নেই। সব ধরনের মাদকাসক্তি ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে ইসলাম প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন। আমীন ।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন, সূরা নাহল আয়াত ৬৭ দারুল হাদীস, মিশর ১৯৯৯।

২. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৪৩।

৩. আল কুরআন সূরা বাকারা আয়াত ২১৯।

৪. সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল আশরিবাহ হাদীস নং ৩৬৮৩।

৫. আল কুরআন, সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৯০-৯১।

৬. আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৭৯ প্রাগুক্ত।

৭. সূনানে আবু দাউদ, প্রাগুক্ত হাদীস নং ৩৬৮০, কিতাবুল আশরিবাহ জামি তিরমিযী, আবওয়াবুল আশরিবাহ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮, হাদীস নং ১৮৬৩, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৩৭০।

৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৮২, সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০০১, জামি তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৩৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৫৫৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৮৬।

৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৮১ প্রাগুক্ত, জামি তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৬৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৯৩।

১০. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৮৭, প্রাগুক্ত জামি তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৬৭।

১১. সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৩৮৬, প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৮৩।

১৩. প্রাগুক্ত হাদীস নং ৩৬৮৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩৩ সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৫৬০৬।

১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ খণ্ড ৪, খাম্‌র নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫. আল হিদায়া খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৭৬, কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. সুনানে নাসাঈ ১/২৯৭।

১৮. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মদ পানের অপকারিতা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সীরাত লাইব্রেরী ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৭২১। মাদকাশক্তি থেকে সন্তানদের বাঁচানোর সহজ উপায় আনোয়ারা হাকীম আলী, গাঙচিল প্রকাশনী, মার্চ ২০০০, পৃ ৯।

১৯. দৈনিক ইনকিলাব ২৭শে মার্চ ১৯৯৩ ইং।

২০. দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৩/৬/০৬ ইং।

২১. সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৩৬৭৪ প্রাগুক্ত ইসলামে হালাল হারামের বিধান ১০৪ পৃ.।

২২. ইসলামে হালাল হারামের বিধান পৃষ্ঠা ১০৪।

২৩. আল ফিকহ্ আলা মাযাহিবিল আরবাআ কিতাবুল হুদুদ, হদ্দু শারবিল খামার, লেখক: আ: রহমান আল জাযীরী রহ. দারুল ফিকির ২০০২ বইরুত খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫৩২।

২৬. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫৩৭।

২৭. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫৪০।

২৮. আল কুরআন সূরা মায়িদাহ আয়াত ২।

২৯. আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম: আল্লামা ইউসুফ কারযাভী পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

৩০. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম : আল্লামা তকী উসমানী মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫১।

৩১. আল ফিফহ আলাল মাযাবিহিল আরবাআ ৫/২৮-২৯ প্রাগুক্ত।

৩২. আল কুরআন সূরা বাকারা আয়াত ১৭৩।

৩৩. আল ফিকহ আলাল মাযাবিহিল আরবাআ ৫/২৬ প্রাগুক্ত।

৩৪. রদ্দুন মোহতার আলা দুরিরল মুখতার কিতাবুল আশরিবাহ, দারুইয়াহ ইয়াউত তুরাদুল আরাবী বৈরুত ১৯৯৮, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪০।

৩৪ক. আলফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮ প্রাগুক্ত।

৩৫. আল কুরআন সূরা মায়িদা আয়াত ২।

৩৬. আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ ৫/৩১ প্রাগুক্ত।

৩৬ক. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল আশরিবা, বাবু তাহরিমি তাখলিলিল খামার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৩।

৩৭. আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪।

৩৮. আল কুরআন সূরা নিসা আয়াত ২৯।

৩৯. আল কুরআন সূরা বাকারা আয়াত ১৯৫।

৪০. আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম পৃষ্ঠা ৭৬।

৪১. মাউসুআতুল ফিকহ আল ইসলামী ১২/১৯-২০।

৪২. কানযুল উম্মাল ৫/৩৪৯।

৪৩. মাআরিফুন সুনান, আল্লামা ইউসুফ বিনুরী র. এস. এম সাঈদ কম্পানী পাকিস্তান ১৪১৩ হিঃ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৭, দরসে তিরমিযী, মাওঃ তকীউসমানী, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ ঢাকা খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯১।

৪৪. আল কুরআন সূরা নিসা ১৪০।

৪৫. সুনানে নাসাঈ ৮/৩১৫।

৪৬. আল জামে লি আহকামিল কুরআন ৩/৫২।

৪৭. আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলামঃ ইউসুফ আল কারযাবী ৬২ পৃষ্ঠা।

৪৮. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/১৬০ পৃষ্ঠা।

৪৯. প্রাগুক্ত ২/১৫৯।

৫০. ফতহুল কাদীর আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম ৫/৩১০।

৫১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/১৫৯।

৫২. প্রাগুক্ত।

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. প্রাগুক্ত ২/১৬০।

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. হিদায়া ২/৫২৮।

৫৯. আল ফিকহ্ আলা মাযাহিবিল আরবাআ, ৫/৩৪ প্রাগুক্ত।

৬০. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/১৫১।

৬১. তিরমিযী শরীফ ২/৮।

৬২. বাদায়েউস সানায়ে ৫/১১২।

৬৩. আল মুগনী লি-ইবনে কুদামা ১০/৩২৭।

৬৪. বাদায়েউস সানায়ে ৫/১১৮।

৬৫. সূরা নিসা আয়াত ৪৩।

৬৬. আল মুগনী লি ইবনে কুদামা ১০/২৩৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ৬৬-৮৭

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা (প্রতিনিধি) হিসাবে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষ কখনো অজ্ঞতা বশত আবার কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর দেয়া খিলাফতের দায়িত্ব পালনের অপরিহার্য কর্তব্য থেকে নিজকে বিরত রাখে। অন্য কথায় বলা যায়, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ বারবার ভুল করে। ফলে পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। বলাবাহুল্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল বিষয় বিশেষত শান্তিপূর্ণ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তন্মধ্যে অবিচার-অনাচার, অসততা এবং ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি ও অকার্যকারিতা অন্যতম। কাজেই সমাজ যদি আল্লাহর বিধানের আলোকে গড়ে ওঠে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু দুঃসাধ্য নয়। এ পর্যায়ে আমরা এ প্রবন্ধে বিচার-এর পরিচয়, আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইজমায় বিচার প্রসঙ্গ, বিচারকের পদ, মর্যাদা, গুণাবলী, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, আচরণবিধি, বেতন-ভাতা, উৎকোচ গ্রহণ, পদচ্যুতি/ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

বিচার বা 'কাযা' বা মীমাংসা

আভিধানিক অর্থ : আরবী অভিধানে 'কাযা' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১] ইমাম যুহরী র. বলেন, কাযা-এর অর্থ কোন বিষয়ের বিচার মীমাংসা করা এবং উক্ত কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। আর এজন্য হাকিমকে বিচারক (কাযী) বলা হয়। কখনো এ শব্দটি 'অবশ্য কর্তব্য' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২]

ইমাম আর-রাগিব ইসফাহানী র. বলেন, কাযা শব্দটি কোন ব্যাপারে মীমাংসা করা বুঝায়, চাই তা বাচনিক হোক কি আচরিক।[৩]

দুররুল মুখতার গ্রন্থে শব্দটির দু'টি কিরাআত রয়েছে এবং উভয় শব্দের অর্থ বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া।[৪]

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিচার-এর পারিভাষিক অর্থ : এর একাধিক পারিভাষিক অর্থ পাওয়া যায়।

ক. আল্লামা ইবনে রুশদ র. বলেন, কোন শরয়ী বিধানকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আকারে প্রকাশ করাকে কাযা (বিচার) বলে।[৫]

খ. আল্লামা ইবনে আবেদীন র. কাসিম র. সূত্রে বলেন, বৈষয়িক বিষয়ে সৃষ্ট বিবাদ সম্পর্কে কোন ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় রায়কে 'বিচার' বলা হয়।[৬]

গ. আল্লামা আল-কাসানী আল-হানাফী র. বলেন, মানুষের মাঝে সত্য বিধান কায়েম করার নাম 'বিচার'।[৭]

উপরোক্ত সংগা থেকে এ কথা পরিষ্কার হলো যে, সমকালীন শাসক কর্তৃক বিচারের রায়কে অবশ্য পালনীয় ঘোষণা করা এবং তা কার্যকর করার নাম হচ্ছে 'বিচার'।

আল-কুরআনে বিচার প্রসঙ্গ

কুরআন মজীদের বেশ কিছু স্থানে বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. 'তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন।'[৮]

২. 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[৯]

৩. 'আর তুমি যদি বিচার-নিষ্পত্তি করো, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার করবে; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।'[১০]

৪. 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ– যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। তোমরা যদি পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার সবই খবর রাখেন।'[১১]

৫. 'বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।'[১২]

৬. 'তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করে দিবে অথবা তাদের উপেক্ষা করবে। তুমি যদি তাদের উপেক্ষা করো তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।'[১৩]

৭. 'তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?'[১৪]

৮. ‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।’[১৫]

৯. ‘কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি নাযিল করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর!’[১৬]

১০. ‘তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।’[১৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ন্যায়বিচার করার বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই অবগত হওয়া যায়।

আল-হাদীসে বিচার প্রসঙ্গ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে (৬২২ খ্রি./ ১ হিঃ/ ৬৩২ খ্রিঃ/ ১১ হিঃ) বিবদমান বিষয়ে পক্ষবৃন্দের মধ্যে করেছেন। তিনি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং যারা বিচার-ফায়সালায় পক্ষপাতিত্ব করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও বলেছেন। তিনি বিচার বিভাগীয় বিষয়ে অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

১. হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিবাদীর শপথ এবং একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছেন।[১৮]

২. হযরত মুগীরা রা. মুআবিয়া রা.-এর নিকট পত্র লিখেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয় হারাম করেছেন এবং তিনটি কাজ বারণ করেছে। তিনি হারাম করেছেন, পিতামাতার অবাধ্যতা, জীবিত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া এবং মানুষের হক আদায় না করা ও নাহক কিছু অর্জন করা। তিনি তিনটি কাজ বারণ করেছেন, অনর্থক কথা বলা, অধিক প্রশ্ন করা এবং মাল-সম্পদ বিনষ্ট করা।[১৯]

৩. হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা গবেষণার পর রায় দেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার জন্য

দুটি পুরস্কার রয়েছে। আর যদি তিনি চিন্তা-গবেষণা করে রায় দেয়া সত্ত্বেও ভুল করেন তুবও তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।[২০]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার কামনা করল, অতঃপর উক্ত পদে আসীন হল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার যুলুম অত্যাচারের উপরে প্রধান্য লাভ করে তবে সে জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে তার যুলুম অত্যাচারের দিকটি যদি তার ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে সে হবে জাহান্নামী।[২১]

এছাড়াও নবী স.-এর জীবদ্দশায় উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, মুআয ইবনে জাবাল, আত্তাব ইবনে উসায়দ রা. মদীনা এবং মদীনার বাইরে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্টত বলা যায়, শরীয়আতে বিচার ব্যবস্থা একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি।

উম্মতের ইজমায় বিচার প্রসঙ্গ

সাহাবা কিরামের সময়কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা অঙ্গ সে সম্পর্কে সকল মুসলিম মনীষী ঐকমত্য পোষণ করেন। ইবনে কুদামা র. বলেন, শরীয়তে বিচার ব্যবস্থা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝে মীমাংসা করা হয়।[২২]

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু 'কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো'[২৩] আয়াত নাযিল করেছেন, তাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা ফরয। খুলাফায়ে রাশেদীন যে বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে গেছেন সে ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৪] অর্থাৎ এটা সাহাবা কিরামের সর্বসম্মত রায় এবং সমস্ত সাহাবা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

বিচারক নিয়োগ

জনসাধারণের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। আইনকে বলবৎ ও কার্যকর রাখার লক্ষ হচ্ছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন। আর বিচার বিভাগই আইনের সঠিক প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন নির্দেশ করে থাকে। তাই যুলুমের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক নিয়োগ করা সরকারের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-কে লক্ষ করে বলেন, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) করেছি, অতএব তুমি জনগণের মধ্যে সুবিচার করবে।'[২৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি করবে।'[২৬]

অপর এক আয়াতে আছে : 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা অবগত করিয়েছেন তদনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করতে পারো।'[২৭]

অতএব বিচারকের দায়িত্ব হল, জনগণের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক বিবাদ নিষ্পত্তি করা। বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য যেহেতু একটি ফরজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সেজন্য বিচারক নিয়োগও নিঃসন্দেহে একটি ফরয দায়িত্ব। তাছাড়া মহানবী স. তাঁর জীবদ্দশায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সাহাবীগণকে বিচারক নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রা.-কে মক্কায় বিচারক নিয়োগ করেন। এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বিচারক নিয়োগ করা সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অন্যতম ফরয কর্তব্য।[২৮]

বিচারকার্য পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারকের পদ দেয়া এবং তার তা গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ তার অস্বীকৃতির কারণে উক্ত পদে অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তি নিয়োগ লাভ করলে বিচারকার্য বিঘ্নিত হবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ ব্যাহত হবে। মহানবী স. স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণও বিচারকের পদ গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাও যোগ্য ও ন্যায়বিচারকের সহায় হন। হাদীসে আছে, 'বিচারক যখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারকের আসনে বসেন তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে সৎপথ দেখান এবং যথার্থ বিষয় নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায়বিচার করলে তারা তার সাথে থাকেন আর অবিচার করলে তার প্রতিবাদ করেন এবং তাকে ত্যাগ করেন।'[২৯]

অপর এক হাদীসে আছে, 'বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচারক হয়ে বসা আমর নিকট সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়েও অধিক প্রিয়।'[৩০]

সুষ্ঠু রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। ইসলাম ছাড়া ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বস্তুত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সমাজ থেকে যুলুম-দুর্নীতি ও দুঃশাসনের চির অবসান ঘটবে।[৩১]

বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব বিষয় অর্জিত হয় তার মধ্যে রয়েছে–

১. বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. মযলুমের সাহায্য এবং যালিমের যুলুমের প্রতিরোধ করা হয়।
৩. মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যালিমের যুলুমের অবসান নিশ্চিত হয়।
৪. সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।
৫. সন্ত্রাস নির্মূলে ন্যায়বিচারের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া শরয়ী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বিচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৬. 'সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক সুবিচারের কোন বিকল্প নেই। এ কাজ এই উম্মাতের অন্যতম বৈশিষ্টও বটে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে।'[৩২]

বিচারকের মর্যাদা

যারা আল্লাহর বিধান মুতাবিক শাসনকার্য ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী স.-এর বহু হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সাথে থাকেন যতক্ষণ না সে অন্যায় রায় দেয়। সে অন্যায় রায় দিলে আল্লাহ তাকে তার নিজের যিম্মায় ছেড়ে দেন।'[৩৩]

'ন্যায়বিচারকগণ দয়াময় আল্লাহর ডান দিকে নূরের মিনারসমূহে অবস্থান করবেন।[৩৪]

'বিচারক ইজতিহাদ করে সত্যে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব এবং ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্য একটি সওয়াব।'[৩৫]

বিচারক পদ যেমন গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ, তেমনি তার দায়িত্বও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তারা কাফির, যালিম, ফাসিক।'[৩৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার নেই। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হলো।'[৩৭]

মহানবী স. বলেন, 'বিচারক তিন শ্রেণীভুক্ত, একজন জান্নাতে যাবে এবং দুইজন জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করার পর তদনুযায়ী রায় প্রদান করে সে জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামে যাবে।'[৩৮]

বিচারক আল্লাহর বিধান মুতাবিক বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বাধ্য। অন্যথায় তাকে কাফির, ফাসিক ও যালিমরূপে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর বিধান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিচারকের বিকল্প চিন্তা করার কোন এখতিয়ার নেই।

মহানবী স. আরো বলেন, 'যাকে জনগণের বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হলো।'[৩৯]

বিচারকের গুণাবলী

বিচারকের অনেক গুণাবলী থাকতে হয়। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি গুণাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. মুসলমান হওয়া

২. স্বাধীন হওয়া
৩. বুদ্ধিমান ও বালেগ হওয়া
৪. আহকামে শরীআ সম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়া
৫. পুরুষ অথবা নারী হওয়া
৬. ন্যায়বিচারক হওয়া
৭. তাকওয়ার গুণসম্পন্ন হওয়া
৮. বিচারকার্যে নিরপেক্ষ হওয়া
৯. ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া
১০. শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, চক্ষুষ্মান ও বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া।[৪০]

১. মুসলমান হওয়া : বিচারক একটি প্রতিনিধিত্বশীল দায়িত্ব। কাজেই এ প্রতিনিধিত্ব কোন অমুসলিম মুসলিমের উপর কার্যকর করতে পারে না। কারণ বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।'[৪১] দ্বিতীয়ত বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় ইসলামী শরীয়াতের বিধান মোতাবেক। কোন অমুসলিম এই বিধান মানতে মোটেই বাধ্য নয়। যে বিধানের প্রতি তার বিশ্বাস নেই সেই বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব তাকে দেয়া যায় না।
মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. প্রবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারক হওয়ার জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত ছিল মুসলমান হওয়া। তিনি স্বয়ং ইয়াহূদীদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করেছেন কিন্তু তিনি অমুসলিম বিচারক নিয়োগ করেননি। তিনি মনে করতেন, তাদের পক্ষে সুবিচার কায়েম করা সম্ভব নয় এবং তাদের উপর আস্থাও রাখা যায় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে কিতাবীগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক বিষয় তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করেন। আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।'[৪২]
আল্লাহর বাণী গোপন করার কারণে মহানবী স. তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। তবে সত্য শরীয়ত তাদের মধ্যে যা ছিল এবং যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তিনি সে আলোকে বিচার-ফয়সালা করতেন বা অন্যদের মাধ্যমে করাতেন। যেমন ইয়াহূদী বনূ কুরাইযার ব্যাপারে সা'দ ইবনে মুআয রা. ইয়াহূদীদের আইনের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[৪৩] ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, অমুসলিম ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের লোকদের জন্য বিচারক নিয়োজিত হতে পারেন।[৪৪]
২. স্বাধীন হওয়া : বিচারককে স্বাধীন হতে হবে। দাস কখনো স্বাধীন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কেননা যার নিজের ভেতরে ঘাটতি থাকে সে ঘাটতিমুক্ত ব্যক্তির উপর প্রাধান্য রাখে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না।'[৪৫]

৩. *বুদ্ধিমান ও বালেগ হওয়া :* বিচারক এমন হবেন, যিনি বাদী ও বিবাদীর প্রার্থীত বিষয় বুঝে তাদের মধ্যকার বিবাদের সুষ্ঠু বিচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন। ইমাম মাতুরিদী র. বলেন, বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে শুধু 'আকল' (বুদ্ধি) যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে ভুলত্রুটি মুক্ত সঠিক বিষয়টি বের করে আনা যায়। উল্লেখ্য, বিচারক যেন তার মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কঠিন বিষয়কে সহজসাধ্য করে উপস্থাপন করতে পারেন। মহানবী স. বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে : ১.নাবালক, যতক্ষণ বালেগ না হয়; ২. নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ জাগ্রত না হয় এবং ৩. উন্মাদ, যতক্ষণ উন্মাদনা দূর না হয়।'[৪৬]

৪. *আহকামে শরীয়া সম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়া :* বিচারককে আহকামে শরীয়ার (ইসলামী আইন) ব্যাপারে প্রাজ্ঞ হতে হবে। কারণ সুবিচার কায়েম করতে হলে আহকামে শরীয়ার জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এগুলোর প্রতিটির ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[৪৭]

বিচারক হিসেবে নারী : ইমাম আবু হানীফা র. ও তাঁর অনুসারীগণ বলেন, নারীদের বিচারকের পদ অলংকৃত করা সাধারণ ভাবে জায়েয। যুক্তি উপস্থাপন করে তাঁরা বলেন, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একত্রে একজন পুরুষ এবং দুজন নারীর সাক্ষ্য যেহেতু গ্রহণযোগ্য এবং তা যেহেতু প্রতিনিধিত্বশীল, তাই বিচারকের পদ অলংকৃত করা তাদের জন্য জায়েয। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল রা. এ বিষয়ে নেতিবাচক মত পোষণ করেন।[৪৮]

* ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র.-এর মতে সাধারণভাবে নারীদের বিচারকের পদ অলংকৃত করা জায়েয। কারণ তারা বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দানের বিষয়ে অধিকারপ্রাপ্ত।[৪৯]

* শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী একদল আলিমের শাসক নারীকে বিচারক নিয়োগ করলে তিনি বিচার কার্য সম্পাদন করার অধিকার লাভ করবেন।

বর্তমানকালে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগের জন্য উচ্চশিক্ষিত মেধাবী তরুণ যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হয়। তাদেরকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেশীয় আইন ও দেশ শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়। তাদের এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এরূপ ব্যস্থাপনার আওতায় দক্ষ ও মেধাবী নরীদের বিচার বিভাগসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগদানে শরীয়াতে কোন বাধা নেই।

৬. *ন্যায়বান হওয়া :* ইমাম মাতুরিদী র. বলেন, বিচারক হবেন সত্যবাদী, আমানতদার, নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে পবিত্র, সজ্জন, ন্যায়নীতিতে অবিচল, আল্লাহর ক্রোধ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে সচেতন এবং দীন-দুনিয়ার কাজে মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ র.-এর মতে বিচারকের ন্যায়বান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিচারক কখনো ফাসিক পাপাচারী হবেন না এবং যেনার অপবাদ আরোপকারী হিসাবে দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন না। মোটকথা, অবিশ্বস্ত লোক বিচারক হবে না।[৫০] কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।'[৫১]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, ফাসিকের সাক্ষী যেহেতু গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই বিচারকের পদে তার নিয়োগও কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, নিরূপায় না হলে ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা সমীচীন নয়। যেমন সাক্ষ্য গ্রহণের বেলায় বিচারক ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না। এক্ষেত্রে বিচারক ইচ্ছা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন, তবে এটা গুনাহের কাজ।[৫২]

৭. *তাকওয়া :* বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে তাকওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচারক মুত্তাকী আল্লাহ ভীরু না হলে যে কোন ধরনের অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারেন। এজন্য আল-কুরআনে যখনই কোন বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে তখন তাকওয়ার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।[৫৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।'[৫৪]

বিচারকার্য যেহেতু একটি সহযোগিতামূলক বিষয়, তাই তা তাকওয়ার ভিত্তিতেই হতে হবে, অন্যথায় ন্যায়বিচার প্রহসনে এবং আমানতের খিয়ানতে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়ে দিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা করো এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না।'[৫৫]

মহানবী স. আলা ইবনুল হারামী রা.-এর উদ্দেশ্যে যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে তিনি তাঁকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫৬]

৮. *নিরপেক্ষ বিচারকার্য :* বিচারক নিরপেক্ষ হবেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার-ফয়সালা করবেন, কারো প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ তার পদমর্যাদার পরিপন্থী। এমনকি শত্রুর প্রতিও অবিচার করা যাবে না। এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : 'হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।'[৫৭]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আদল ও ইনসাফের পাশাপাশি নিরপেক্ষতা অবলম্বন একান্ত জরুরী।[৫৮]

মহানবী স. বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'অন্যায়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন। যখন সে অন্যায়ে লিপ্ত হয় তখন তিনি তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে জড়িয়ে ধরে।'[৫৯]

অপর এক হাদীসে আছে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও সবচেয়ে নিকটে উপবেশনকারী হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং সর্বাধিক ঘৃণ্য ও দূরে অবস্থানকারী হচ্ছে যালিম শাসক।'[৬০]

৯. ইজতিহাদ করার যোগ্যতা : ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এবং কতিপয় হানাফী আলিমের মতে, বিচারকের মুজতাহিদ হওয়া শর্ত। কাজেই শরীআ আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বিচারক হওয়ার অবকাশ নেই।[৬১] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করো।'[৬২] 'আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়ে দিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো।'[৬৩]

ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, বিচারককে মুজতাহিদ হতে হবে, এমন শর্তারোপ করা যথার্থ নয়। বরং এ শর্তকে তিনি অপরিহার্য না বলে মুস্তাহাব বলেছেন। কাজেই বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে বিচারক যদি মুজতাহিদ নাও হন, তবুও তার বিচার-মীমাংসা মেনে নিতে হবে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, বিচার মীমাংসার মাধ্যমে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে ফয়সালা দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন, বিচারকের মুজতাহিদ হওয়া শর্ত না হলেও শরীয়াতের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি বিচারক হতে পারে না। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে অসত্যের পক্ষে অজান্তে রায় দিয়ে বসতে পারে।[৬৪]

বিচারক মুজতাহিদ না হলেও তার রায় মেনে নিতে হবে। তবে একজন বিচারকের মাঝে সাধারণ পাণ্ডিত্য, সততা, নিষ্ঠা, তাকওয়া, ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়। এ অভিমত ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ র.-এর।[৬৫] ইমাম মালিক র. বলেন, বিচারকের ফয়সালা মান্য করা হবে তার মুজতাহিদ হওয়া সাপেক্ষে।[৬৬]

১০. শ্রবণশক্তি, চক্ষুষ্মান ও বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া : বিচারক হবেন চক্ষুষ্মান, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তিসম্পন্ন। এ বিষয়গুলো একজন বিচারকের বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তিনি বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝে কে হকদার এবং কে হকদার নয় তা যথার্থভাবে নিরূপণ করে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন না।

বিচারকের আচরণবিধি

বিচার কার্যক্রমে মহানবী স. বিভিন্ন ধরনের আচরণবিধি অনুসরণ করতেন যা বিচার ব্যবস্থার নীতিমালার রূপ ধারণ করেছে। যথা-

১. বিচারক ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন না। কেননা হাদীসে আছে, 'বিচারক ক্ষুব্ধ অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।'[৬৭]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শোনার পর বিচারক রায় ঘোষণা করবেন। মহানবী স. বলেন, 'তোমার কাছে দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করলে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিবে না।'[৬৮]

৩. ইসলামী শরীয়ামতে, বাদী-বিবাদী সকল পর্যায়ে বিচারকের সামনে সমান মর্যাদার অধিকারী। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সুন্নাত হলোঃ বাদী-বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনা-সামনি অবস্থান করবে।[৬৯]

   মুহাম্মদ ইবনে নায়ীম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা-এর একটি মোকদ্দমা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইবনুল হাকাম এসে আবূ হুরায়রা রা.-এর গদীতে বসেন। আবূ হুরায়রা রা. ভাবলেন, হয়ত কোন প্রয়োজনে সে এসেছে। ইতোমধ্যে আরেক ব্যক্তি এসে আবূ হুরায়রা রা.-এর সামনে বসলো। তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন এসেছ? সে বললো, এই হারিস আমার সাথে বাড়াবাড়ি করছে। আবূ হুরায়রা রা. বললেন, হে হারিস! উঠো এবং তোমার বাদীর সাথে গিয়ে বসো। কারণ এটাই হচ্ছে আবুল কাসিম স.-এর সুন্নাত।[৭০] এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান কালে বিবাদীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। শরীয়াত মতে সে তার সুবিধামত দাঁড়াতে বা বসতে পারে।

৪. বিচারক বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সাথে সমানভাবে ইশারা-ইঙ্গিত করবেন। মহানবী স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক নিযুক্ত হয় সে যেন তাদের মাঝে দৃষ্টি বিনিময়, ইশারা-ইঙ্গিতে ও মজলিসের আসনে ইনসাফ কায়েম করে।'[৭১]

৫. কোন পক্ষকে উচ্চঃস্বরে সম্বোধন করা উচিত নয়। মহানবী স. বলেন, 'যাকে মুসলমানদের বিচারক নিয়োগ করা হয় সে যেন বাদী-বিবাদী কোন এক পক্ষের তুলনায় অপর পক্ষের সাথে উচ্চঃস্বরে কথা না বলে, যদি না প্রতিপক্ষের শ্রবণশক্তি ত্রুটিযুক্ত হয়।'[৭২]

৬. বাদী-বিবাদীর মধ্যে কোন এক পক্ষকে আপ্যায়ন করা বিচারকের উচিত নয়। বর্ণিত আছে, আলী রা. যখন কূফায় অবস্থান করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে। অতঃপর সে আলী রা.-এর সামনে মোকদ্দমা দায়ের করে। আলী রা. তাকে বললেন, এখন তুমি মোকদ্দমার এক পক্ষ। তাই তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য কারো বাড়িতে চলে যাও। কেননা নবী স. বাদী-বিবাদীর যে কোন এক পক্ষকে মেহমানদারী করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ অপর পক্ষকে মেহমান করা না হয়। মামলার এক পক্ষকে মেহমানদারী করবে না। যদি করতে হয় তবে উভয় পক্ষেরই করবে।'[৭৩]

৭. বাদী-বিবাদীর মাঝে বৈষম্য করা যাবে না। বিচারের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত, ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে। মহানবী স. বলেছেন, 'হে

মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভু একজন, তোমাদের পিতাও একজন। কাজেই কোন অনারবের উপর কোন আরবের এবং কোন আরবের উপর কোন অনারবের এবং কালো মানুষের উপর লাল মানুষের মর্যাদা নেই। মর্যাদা নির্ণীত হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।'[৭৪]

৮. প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত কিংবা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করা সমীচীন নয়। কারণ এহেন অবস্থায় পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। মহানবী স. বলেছেন, 'বিচারক তখনই বিচারকার্য সম্পাদন করবে যখন সে পিপাসার্ত কিংবা ক্ষুধার্ত থাকবে না।'[৭৫]

৯. রায় প্রদানের পূর্বে ক্ষেত্রবিশেষে পরামর্শ করে নেয়া উচিত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা পরামর্শের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআন মাজীদে একটি সূরার নাম রেখেছেন 'শূরা' পরামর্শ। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের কর্ম সম্পাদন করে।'[৭৬]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'সাথীদের সাথে পরামর্শ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূলের চেয়ে আমি অপর কাউকে নিজ সহকর্মীদের সাথে এত বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি।'[৭৭]

১০. মহানবী স. বিচারক ও প্রশাসকবৃন্দকে উপঢৌকন গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 'মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে ইয়ামনে প্রেরণকালে বললেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কোন বস্তু গ্রহণ করবে না। কারণ তা প্রতারণার শামিল। যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই প্রতারণার বস্তুসহ উপস্থিত হবে। এজন্য আমি তোমাকে ডেকেছি। এখন তোমার কাজে চলে যাও।'[৭৮]

১১. বিচার-মীমাংসা একটি উত্তম কাজ। তাই মহানবী স. বিচারকদেরকে পরকালে প্রতিদানের আশায় সুবিচার করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কোন বিচারক যখন বিচারকার্য সম্পাদন করে এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালায়, আর এতে যদি সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, তবে তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে। আর যদি সে ভুলের শিকার হয়, তবে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।'[৭৯]

১২. বাদী-বিবাদীর মাঝে আপস-রফা করানোর চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহর বাণী : 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন করো।'[৮০]

মহানবী স. বলেছেন, 'এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে। ক্রেতা উক্ত জমিতে স্বর্ণভর্তি একটি কলস পেলো। ক্রেতা বিক্রেতাকে বললো, তুমি আমার নিকট থেকে তোমার স্বর্ণ বুঝে নাও। আমি তো কেবল তোমার নিকট হতে জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বললো, আমি তো তোমার কাছে জমি এবং তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু বিক্রয় করেছি। মহানবী স. বললেন, অতঃপর তারা উভয়ে বিচারকের নিকট গিয়ে এর ফয়সালা চাইল। বিচারক বললো, তোমাদের কি কোন সন্তান আছে? তাদের একজন বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান আছে এবং অপরজন বললো, আমার একটি কন্যা সন্তান আছে।

বিচারক বললো, তোমার পুত্রকে তার কন্যার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও এবং এ উপলক্ষে তোমরা তা থেকে খরচ করো এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা দান করে দাও।[৮১]

১৩. লঘু পাপে গুরুদণ্ড কিংবা গুরু পাপে লঘু দণ্ড বা শাস্তি না দেয়া কোনটাই ইসলাম সমর্থিত নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি বারবার অপরাধ করলে শাস্তিও বেড়ে যেতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, 'মহানবী স.-এর কাছে এক চোর ক্রীতদাসকে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে একে একে চারবার ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পঞ্চমবারে তাকে উপস্থিত করা হলে তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। ষষ্ঠবার চুরির অপরাধে হাযির করা হলে তিনি তার একটি পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সপ্তমবার চুরির অপরাধে তার অপর হাতটি কাটার নির্দেশ দিলেন। অষ্টমবার চুরি করলে তিনি তার দ্বিতীয় পা-টিও কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।'[৮২]

১৪. মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে বিচার-ফায়সালার কাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু মসজিদে তা কার্যকর করা সমীচীন নয়। মহানবী স. বলেছেন, 'মসজিদে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।'[৮৩]

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাকে তার মনের ভাব প্রকাশের শক্তি দান করেছেন এবং যুগে যুগে কিতাব নাযিল করে তাকে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব মানবজাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত ধর্মই হলো আইনের আদি ও প্রধান উৎস, মানুষের মস্তিষ্ক নয়। ধর্মই মানুষকে আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত করেছে। প্রথম মানব হযরত আদম আ.-কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করে আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখন বলে দেন : 'অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধানের আনুগত্য করবে তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্দশাগ্রস্তও হবে না।'[৮৪]

ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীআতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তাই হচ্ছে ইসলামী আইন। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা, প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার ভোগ নিশ্চিত করা, অনধিকার চর্চা থেকে বিরত রাখা এবং কর্তব্য পালনে ও দায় বহনে বাধ্য করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এই আইনের বাস্তবায়নের জন্য বিচার বিভাগ (শরীয়া আদালত) স্থাপন মুসলিম রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।[৮৫]

হযরত মুহাম্মদ স.-কে নির্দেশসূচক বাক্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সৎপথ দেখিয়েছেন, তদনুযায়ী জনগণের মাঝে বিচার মীমাংসা করতে পারেন।'[৮৬]

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-কে শাসক নিয়োগ করে তাঁকেও বিচার বিভাগ স্থাপনের একই নির্দেশ দান করেছিলেন: 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (শাসক) বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করবে।'[৮৭] এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যে সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি উক্ত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সার্বভৌম বিচারকও নিয়োগ করেন।

ইসলামী আইনের প্রধান দুই উৎস কুরআন ও সুন্নাহ এবং এতদুভয়ের পরিপূরক দুই উৎস ইজমা ও কিয়াস অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বিচারক নিয়োগ একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বিচার বিভাগই আইনের সঠিক প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন নির্দেশ করে থাকে। বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য যেহেতু একটি ফরয প্রতিষ্ঠা করা, তাই বিচারক নিয়োগও নিঃসন্দেহে একটি ফরয কর্তব্য।

মহানবী স.-এর বাস্তব কর্মপন্থা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি নিজেও বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সাহাবীগণকে বিচারক নিয়োগ করেন। অনুরূপভাবে সৎপথপ্রাপ্ত চারজন খলীফাও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিয়োগ করেন। হযরত আলী রা.-এর শাসন আমলে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিভাগ হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মহানবী স., খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী শাসকগণের আমলে রাষ্ট্রীয় সংগঠন প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। শাসন বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও বিচার বিভাগ। পরবর্তীকালে সামরিক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ করা হয়। তৎকালে নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তর পর্যন্ত বর্তমান কালের মত এতগুলো স্তর ছিল না। খলীফা হারূনুর রশীদ একটি সর্বোচ্চ আদালত স্থাপন করেন এবং উক্ত আদালতের বিচারকের জন্য (প্রধান বিচারপতি) 'কাযীল কুযাত' পদবী প্রচলন করেন। মানবজাতির বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে মুসলমানগণই এভাবে সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ আদালত স্থাপন করেন।[৮৮]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা প্রদত্ত হলো।

খলীফা উমর রা. ও উবাই ইবনে কা'ব রা. বাদী-বিবাদীরূপে আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক যায়েদ ইবনে সাবিত রা. খলীফার বসার জন্য একটি আসন এগিয়ে দিলেন। খলীফা প্রতিবাদ করে বলেন, এটা আপনার প্রথম অন্যায়। অতঃপর তিনি বিচারকের সামনে বিবাদীর সাথে একই সমতলে বসে পড়েন।[৮৯]

একদা আলী রা.-এর বর্ম চুরি হলে তা এক ইয়াহূদীর নিকট পাওয়া গেল। কিন্তু ইয়াহূদী সেটিকে নিজের বলে দাবি করে। আলী রা. তাঁর নিয়োগকৃত বিচারপতি শুরায়হ রা.-এর আদালতে মামলা

দায়ের করেন। নির্দিষ্ট তারিখে তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে সাক্ষীরূপে পেশ করেন। কিন্তু বিচারক তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সাক্ষীদ্বয় কি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নয়? শুরায়হ র. বলেন, তাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু পিতার অনুকূলে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই বলে তিনি খলীফার মোকদ্দমাটি খারিজ করে দেন।[৯০]

আব্বাসী খলীফা হারুনূর রশীদের বিরুদ্ধে এক ইয়াহূদী নাগরিক মোকদ্দমা দায়ের করলে প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসূফ র. খলীফাকে আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশের জন্য সমন জারী করেন। তিনি সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। এই মোকদ্দমার রায় তাঁর বিপক্ষে যায় এবং তিনি তা নীরবে মেনে নেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে প্রধান বিচারপতির আদালতে এক নাগরিক তাঁর বিরুদ্ধে আরজী পেশ করে। তিনি সশরীরে আদালতে উপস্থিত হন এবং বিচারের রায় তাঁর বিরদ্ধে যায়। বিচার শেষে তিনি তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করে বলেন, কাযী সাহেব! আপনি যদি ন্যায়বিচার না করতেন তবে আমার এই তরবারি আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করতো। কাযী সাহেব তাঁর চাবুক উঁচিয়ে বললেন, আপনি যদি বিচারের রায় মেনে না নিতেন তবে এই চাবুক আপনার পিঠকে রক্তরঞ্জিত করতো। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের যুগে বিচারকগণ এরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন।[৯১]

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকগণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিসাসের আওতায় অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার আশংকা হলে বিচারক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে স্বেচ্ছায় দিয়াত গ্রহণে সম্মত করে অপরাধীকে লঘু দণ্ড দিতে পারেন। হদ্দের আওতাধীন অপরাধীর বেলায় তিনি যদি সামান্যতম ত্রুটি পেয়ে যান তাহলে অপরাধীকে হস্তকর্তন বা বেত্রদণ্ড প্রদানের পরিবর্তে লঘু দণ্ড দিতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তির যিনার ক্ষেত্রে তিনি চারজন প্রত্যক্ষ পুরুষ সাক্ষী পাওয়ার পরও যদি তাদের সাক্ষ্যদানে গরমিল খুঁজে পান, তাহলে তিনি অপরাধীকে লঘুদণ্ড, এমনকি ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তা'যীরের আওতাধীন শাস্তির মাত্রা ও প্রকার নির্ধারণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিচারকের সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি অপরাধীকে শরীয়া আইনে নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহের যেটি উপযুক্ত মনে করেন, সেই শাস্তি দিতে পারেন অথবা বেকসুর খালাসও দিতে পারেন। অবশ্য তিনি শরীয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহের বাইরে ভিন্নতর কোন শাস্তি দিতে পারেন না।[৯২]

ইসলামী আইনের অধীনে বিচারক আরও একটি বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করেন। 'সমঝোতা' (আস-সুলহ) আইনের আওতায়, একমাত্র হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ ব্যতীত, বিচারক আদালতের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বা কার্যক্রম চলাকালে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন। এই অবস্থায় অতি সহজে ও সংক্ষিপ্ত সময়ে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতে পারে। একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বিচারের নামে সময়ক্ষেপণ করে পক্ষবৃন্দকে অযথা হয়রানি করার অধিকার বিচারকের নেই।[৯৩]

বেতন-ভাতা

বিচারক তার সম্মানজনক বেতন-ভাতা এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল-মাল (সরকারি কোষাগার) থেকে লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হলে তাদের বেতন-ভাতাও বায়তুল-মাল হতে প্রদান করা হবে। কেননা মহানবী স. হযরত আলী রা.-এর জন্য পাঁচ শত দিরহাম মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন।[৯৪]

কেউ কেউ বলেন, বিচারক যদি দরিদ্র হন তাহলে তিনি তার নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতা নিতে পারেন। আর তিনি যদি ধনী হন তবে বেতন-ভাতা গ্রহণ না করাই তার জন্য উত্তম, তবে ইচ্ছা করলে নিতে পারেন।[৯৫] মহানবী স. বলেছেন, 'আমরা কোন ব্যক্তিকে সরকারি কাজে নিয়োগ দিলে তার বাসস্থান না থাকলে তার ব্যবস্থা করে দিব, তার পরিচারক না থাকলে আমরা তার ব্যবস্থা করে দিব এবং তার স্ত্রী না থাকলে আমরা তার বিবাহের ব্যবস্থা করবো।'[৯৬]

বর্ণিত আছে যে, আত্তাব ইবনে উসাইদ রা.-কে মহানবী স. মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণের সময় প্রতি বছরের বেতন হিসেবে চার শত দিরহাম নির্ধারণ করে দেন।[৯৭]

আরো বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে প্রত্যহ সোয়া দুই দিরহাম অথবা ২.৭৫ দিরহাম বায়তুল-মাল থেকে ভাতা হিসেবে গ্রহণ করতেন।[৯৮]

ফকীহগণ বলেন, বিচারক যদি ধনী হন এবং বায়তুল-মাল থেকে বেতন-ভাতা না নিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, তবে বেতন-ভাতা গ্রহণ না করাই উত্তম। অবশ্য বিচারকের জন্য এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের জন্য যে কোন অবস্থায় বেতন-ভাতা গ্রহণ করা বৈধ। উল্লেখ্য যে, বেতন-ভাতা গ্রহণ করলেও তাঁর কাজ বেতনের বিনিময় হিসাবে গণ্য করা হবে না, বরং আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় তিনি কাজ করছেন বলে গণ্য হবে। বিচারক তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণও বায়তুল-মাল থেকে গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি তার কাছে এসে কেউ মারা গেলে তার কাফন-দাফন বাবদ ব্যয়ও বায়তুল-মাল থেকে গ্রহণ করতে পারেন।[৯৯]

উৎকোচ

বিচারকের জন্য হাদিয়া ও বখশিশ গ্রহণ করা জায়েয কিনা এ বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে হাদিয়া-বখশিশ ও ঘুষের মধ্যকার পার্থক্য জেনে নেয়া জরুরী। হাদিয়া হচ্ছে এমন সম্পদ যা বিনা শর্তে নি:স্বার্থভাবে দান করা হয়। আর ঘুষ হচ্ছে এমন জিনিস যা সুবিধাদানের শর্তে প্রদান করা হয়।[১০০] হাদিয়া আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বিচারকের জন্য বিচারক পদে আসীন থাকাকালে কোন ধরনের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। আদালতে যে ব্যক্তির মামলা বিচারাধীন সে যদি বিচারককে কোন ধরনের হাদিয়া প্রদান করে তাহলে বিচারক তা কোন মতেই গ্রহণ করবেন না, চাই হাদিয়া প্রদানকারী আত্মীয় হোক কি অপরিচিত, বিচারক

নিয়ুক্তির পর পরিচিত হোক কি পূর্ব পরিচিত, কোন অবস্থায় এ ধরনের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না।[১০১]

তবে যে ব্যক্তির কোন মোকদ্দমা বিচারাধীন নেই সে যদি বিচারককে কোন হাদিয়া প্রদান করে, তবে বিচারক তার হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেন। অপরদিকে বলা যায়, বিচারক যদি অবাঞ্ছিত ভাবে হাদিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাকে বায়তুল-মালে তা ফেরত দিতে হবে। ফকীহদের মতে, হাদিয়া প্রদানকারীর পরিচয় জানা থাকলে তা তাকে ফেরত দিতে হবে।[১০২]

বিচারকের পদচ্যুতির কারণসমূহ

'বিচারক-এর পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে মানুষের অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেবল বিচারকের ক্ষেত্রেই নয়, কারো দ্বারা যেন কারো অধিকার কোনভাবে নষ্ট না হয় ইসলাম সে অধিকার নিশ্চিত করে। ঠিক একইভাবে নিম্নবর্ণিত কারণে বিচারক সহসা নিজ পদ হারাবেন।

ক. দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হলে।
খ. শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হলে।
গ. জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হলে।
ঘ. মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হলে।[১০৩]
ঙ. নিয়োগকর্তা তাকে সঙ্গত কারণে অব্যাহতি দিলে।
চ. বিচারক উৎকোচ গ্রহণ করেছেন প্রমাণিত হলে।
ছ. চাকরির মেয়াদ শেষ হলে।
জ. স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিলে এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক তা গৃহীত হলে।
ঞ. উন্মাদ হলে।
ট. মৃত্যুবরণ করলে।
ঠ. কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপরাগ হলে।

এক কথায় বলা যায়, যেসব কারণে ওয়াকীলের প্রতিনিধিত্বের অবসান ঘটে ঠিক একই কারণে বিচারকের দায়িত্বেরও অবসান ঘটে। তবে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। আর তা হচ্ছে, নিয়োগকর্তার মৃত্যুর সাথে সাথে প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের অবসান ঘটে কিন্তু বিচারকের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার মৃত্যুতে তার দায়িত্বের অবসান ঘটে না। নিয়োগকর্তা বিচারককে অব্যাহতি দিলে তা যথারীতি তাকে অবহিত করতে হবে। তাকে অবহিত না করা পর্যন্ত বা তিনি অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তার বিচার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বৈধ গণ্য হবে।[১০৪]

উপসংহার

মানুষ বুদ্ধিনিষ্ঠ সামাজিক জীব। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ ভিন্নতার কারণে একের সাথে অপরের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া

অস্বাভাবিক নয়। এর ফলে কখনো কখনো একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে আদালতের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কখনো বাদী আবার কখনো বিবাদী মানব মস্তিষ্ক প্রসূত বিচার বিভাগ থেকে ন্যায়বিচার লাভে বঞ্চিত হয়। ফলে মানব জীবনে দুর্দশা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ দুর্দশা থেকে উত্তরণ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থাকে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. আল-ফীরূযাবাদী, আল-কামূস, ফসল-আল-কাফ, ইস্তাম্বুলঃ ১৩০৫/১৯৮৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১; আবুল কাসিম আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আর-রাগিব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪২৬/২০০৫, পৃ. ৪০৬।

২. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, মিসরঃ তাঃ বি, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২।

৩. আর-রাগিব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪০৬।

৪. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিকহ, ভারত; দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো (১৩৮১/১৯৯১), পৃ. ৪৩১-৪৩২।

৫. মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবনে তুল্লা আল-আন্দালুসী, আকদিয়াতুর রাসূল, লাহোরঃ ইদারায়ে মা'আরিফ ইসলামী, মানসূরা, ১৯৮৭, পৃ. ২১।

৬. ইবনে আবেদীন, দুররুল মুখতার-এর টীকা, বৈরূতঃ ১৩৮৬/১৯৬৬, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২।

৭. আল-কাসানী, বাদাই'উস-সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই', বৈরূতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৩/১৯৮২, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

৮. আল-কুরআন ৫ : ৮।

৯. আল-কুরআন ১৬ : ৯০।

১০. আল-কুরআন ৫ : ৪২।

১১. আল-কুরআন ৪ : ১৩৫।

১২. আল-কুরআন ৭ : ২৯।

১৩. আল-কুরআন ৫ : ৪২।

১৪. আল-কুরআন ৫ : ৫০।

১৫. আল-কুরআন ২ : ১৮৮।

১৬. আল-কুরআন ৫ : ৪৯-৫০।

১৭. আল-কুরআন ৪ : ৫৮।

১৮. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদঃ উজূবিল হুকম বি-

শাহিদিন ওয়া ইয়ামীন, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ৪৪৭২, পৃ. ৯৮১।

১৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদঃ আন-নাহি 'আন কাছরাতিল মাসাইল...., (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৪৪৮৬, পৃ. ৯৮২।

২০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ আজরুল হাকিমি ইযা ইজতাহাদা...., হাদীস নং ৪৪৮৭, পৃ. ৯৮২।

২১. ইমাম আবু দাউদ, সুনান, অধ্যায়ঃ আল-কাদা, অনুচ্ছেদঃ ফিল-কাদী ইউখতি (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩৫৭৫, পৃ. ১৪৮৮।

২২. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, কায়রোঃ ১৪২৫/২০০৪, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

২৩. আল-কুরআন ৫ : ৪৯।

২৪. আল-কাসানী, বাদাই'উস সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই', প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২।

২৫. আল-কুরআন ৩৮ : ২৬।

২৬. আল-কুরআন ৫ : ৪৮।

২৭. আল-কুরআন ৪ : ১০৫।

২৮. আল-কাসানী, বাদাই'উস সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই', প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২।

২৯. ড. ওয়াহাবা আল-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৯/১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮০।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১।

৩১. ড. আকীল ইবনে নাসির, আল-কাদা ফী আহদি উমারাবনিল খাত্তাব, রিয়াদ, দারুল মাদানী, ১৪০৬/১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৩২. আল-কুরআন ৩ : ১১০।

৩৩. ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ আত-তাগলীযু ফিল-হাইফি ওয়ার-রিশওয়াহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ২৩১২, পৃ. ২৬১৫।

৩৪. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম অধ্যায়ঃ আল-ইমারাত, অনুচ্ছেদঃ ফাদীলাতুল ইমামিল আদিল (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৪৭২১, পৃ. ১০০৫-০৬।

৩৫. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ আজরুল হাকিম ইযা ইজতাহাদা ফা-আসাবা আও আখতা, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ৭৩৫২, পৃ. ৬১১-৬১২।

৩৬. আল-কুরআন ৫ : ৪৪, ৪৫, ৪৭।

৩৭. আল-কুরআন ৩৩ : ৩৬।

৩৮. ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ আল-হাকিম ইয়াজতাহিদু ফাইউসিবুল-হাক্ক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩১৫, পৃ. ২৬১৫।

৩৯. প্রাগুক্ত অধ্যায়: আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ: যিকরুল কুদাত, হাদীস নং ২৩০৮, পৃ. ২৬১৫।

৪০. ফাতওয়া আলমগীরী, অধ্যায়: আদাবুল কাযী, দারু ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৪০৬/১৯৮৬, ৩য় খণ্ড পৃ. ১১।

৪১. আল-কুরআন ৪ : ১৪১।

৪২. আল-কুরআন ৫ : ১৫।

৪৩. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ইস্তীযান, অনুচ্ছেদ: কওলুন নাবিয়্যি (সা.) কুমূ ইলা সায়্যিদিকুম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬২৬২, পৃ. ৫২৮।

৪৪. আস-সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, আল-কাহিরা: ১৪০৭/১৯৮৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২০।

৪৫. আল-কুরআন ১৬ : ৭৫।

৪৬. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ: মান রাদ্দা শাহাদাতাস-সিবয়ান, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

৪৭. আল-কুরআন ১৭ : ৩৬।

৪৮. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৪৫।

৪৯. সূরা বাকারা ২৮২।

৫০. আল মাওসুআ, ২য় কলাম, পৃ. ২৯৪।

৫১. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারই, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩।

৫২. আল-কুরআন ৪৯ : ৬।

৫৩. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারাগী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, অধ্যায়: আদাবুল কাযী, বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৪০৬/১৯৮৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬।

৫৪. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮।

৫৫. আল-কুরআন ৫ : ২।

৫৬. আল-কুরআন ৪ : ১০৫।

৫৭. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮।

৫৮. আল-কুরআন ৫ :৮।

৫৯. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯।

৬০. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিল ইমামিল আদিল, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ১৩৩০, পৃ. ১৭৮৫।

৬১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩২৯।

৬২. ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৪৬।

৬৩. আল-কুরআন ৫ : ৪৯।

৬৪. আল-কুরআন ৪ : ১০৫।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩-৭৪৬।

৬৬. ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৪৩-৭৪৬।

৬৭. প্রাগুক্ত।

৬৮. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ হাল ইয়াকদিল কাদী আও ইউফতি ওয়া হুয়া গাদবানু, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ৭১৫৮, পৃ. ৫৯৬।

৬৯. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিল কাদী লা-ইয়াকদী বাইনাল খাসমাইনি হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৩১, পৃ. ১৭৮৫।

৭০. ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়ঃ আল-কাদা, অনুচ্ছেদঃ কাইফা ইয়াজলিসুল খাসমানি বাইনা ইয়া-দায়িল কাদী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৫৮৮, পৃ. ১৪৮৯।

৭১. সীরাত বিশ্বকোষ, ইফা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।

৭২. প্রাগুক্ত।

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. আল-কুরআন ৪২ : ৩৮।

৭৮. সীরাত বিশ্বকোষ, ইফা, প্রাগুক্ত ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬।

৭৯. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফী হাদায়াল-উমারা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৩৫, পৃ. ১৭৮৫।

৮০. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিল কাদী ইউসীবু ওয়া ইউখতিউ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩২৬, পৃ. ১৭৮৫।

৮১. আল-কুরআন ৪৯ : ১০।

৮২. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-আকদিয়া, অনুচ্ছদঃ ইসতিহবাবু ইসলাহিল হাকিমি বাইনাল খাসমাঈন, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ৪৪৯৭, পৃ. ৯৮৩।

৮৩. সীরাত বিশ্বকোষ, ইফা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৭।

৮৪. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায়: আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফির-রাজুলি ইয়াকতুলু ইবনাহু ইউকাদু মিনহু আম-লা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪০১, পৃ. ১৭৯৩।

৮৫. আল-কুরআন ২ : ৩৮।

৮৬. আল-কাসানী, বাদাই'উস সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই', প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২; ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

৮৭. আল-কুরআন ৪ : ১০৫।

৮৮. আল-কুরআন ৩৮ : ২৬।

৮৯. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ঢাকা: ইসলামী আইন ও বিচার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৫০-৫৮।

৯০. মুহাম্মদ ইবনে খালাফিল ওয়াফী, আখবারুল কুদাত, বৈরূত: তা: বি:, পৃ. ১৪৯।

৯১. আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, অধ্যায়: আশ-শাহাদাহ, অনুচ্ছেদ: মান ইউকবালু শাহাদাতুহ ওয়া মান লা ইউকবালু প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৯২. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ইসলামী আইন ও বিচার, ২০০২, পৃ. ৫৬-৫৭।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. প্রাগুক্ত।

৯৫. প্রাগুক্ত, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ১৪।

৯৬. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৯৮. প্রাগুক্ত।

৯৯. প্রাগুক্ত।

১০০. প্রাগুক্ত।

১০১. ফাতাওয়া আলামগীরী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৩২।

১০২. প্রাগুক্ত।

১০৩. প্রাগুক্ত।

১০৪. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই, অধ্যায়: আল-ওয়াকালা, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৮-১০১

ইসলামে দৃষ্টিতে বর্গাচাষ : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার জীবন নির্বাহের জন্য চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। মানব সভ্যতার শুরুতে জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ ও জটিলতামুক্ত। ফলে মানুষ সহজেই তার জীবন নির্বাহ করতে পারতো। যে ব্যক্তি যতটুকু ভূমি আবাদ করতো তাই নিয়ে সে ছিল সন্তুষ্ট। নিজ স্বার্থে অপর মানুষের শ্রম ব্যবহার করার প্রবণতা তখনো দেখা দেয়নি। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব, দারিদ্র্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামন্ত ও জোতদারদের চক্রান্ত ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভূমি হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে। ফলে ভূমিহীন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। অপর দিকে বিশাল অঞ্চল ও ভূ-ক্ষেত্র কিছু সংখ্যক লোকের করায়ত্ব হয়ে যায়, যা আবাদ করা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে। আধুনিককালে এরাই সামন্ত ও জোতদার নামে পরিচিত। পশুচারণ ও চাষাবাদ ব্যতীত সে সময় তেমন আর কোন রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত চাষী ভূমিহীন হয়ে স্বীয় জীবন নির্বাহের জন্য ক্রমে ভূমি-মালিক, সামন্ত ও জোতদারদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তারা এদের দ্বারস্থ হতে থাকে এবং এই অবস্থা সামন্ত ও জোতদারদের সামনে বিরাট এক সুযোগ এনে দেয়। তাদেরকে এরা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বা উৎপাদিত পণ্যের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে নিজেদের কৃষি-আবাদে নিয়োগ করতে থাকে। তারা এদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধামত এদেরকে চুক্তি করতে বাধ্য করে। তাদের নিজেদের কোন পরিশ্রম করতে হতো না, কোন ধরনের শ্রম বিনিয়োগ করতে হতো না, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি যোগান দিতে হতো না। তারা ভূমি মালিক কেবল এই অধিকারেই এদের উৎপাদিত ফসলের অনেকটা হাতিয়ে নিতো। এই পদ্ধতিই কালক্রমে বর্গাচাষ পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।[১]

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কৃষিতে কম বেশী বর্গা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে কৃষি জমি আবাদের ক্ষেত্রে বর্গা ব্যবস্থা প্রধানত: দুই প্রকার–নগদ বা চুক্তি বর্গা ও ভাগচাষ বর্গা। নগদ বা চুক্তি বর্গা সাধারণত এক বছরের জন্য হয়। এ জন্য এ ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের অনেক স্থানে 'সন কড়ালি' বা 'বছর চুক্তি' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বর্গা নিয়ে বর্গাদার সারা বছর ইচ্ছামত যে কোন ফসলের আবাদ করতে পারে। অপরদিকে, ভাগচাষ

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাড্ডা আলাতুন্নিসা কলেজ, গুলশান, ঢাকা।

বর্গা ব্যবস্থায় বর্গাদার সাধারণত ফসল উৎপাদনের পুরো খরচ বহন করে কিন্তু জমির মালিকের সাথে ফসল আধা-আধি ভাগ করে নেয়। এজন্য অনেক স্থানে এ ধরনের বর্গা ব্যবস্থাকে 'আধিয়া' বলা হয়। তবে, যে সব অঞ্চলে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ শুরু হয়েছে সেখানে জমির মালিকরা বর্গাদারকে সেচ, সার, বীজ ও কীটনাশকের অর্ধেক খরচ দেয়। কোন কোন অঞ্চলে বর্গাদার সকল খরচ বহন করলে সে পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ও জমির মালিক পায় বাকী এক তৃতীয়াংশ। এ ব্যবস্থাকে 'তেভাগা' ব্যবস্থা বলা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ২ ভাগ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪২ হাজার পূর্ণ বর্গাচাষী এবং শতকরা ৩৬ ভাগ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার আংশিক বর্গাচাষী। এ দেশে বর্গাচাষীরা মোট জমির শতকরা ৪১ ভাগ আবাদ করে।[২]

বর্গাচাষ বা মুযারাআ

বর্গাচাষকে আরবীতে 'মুযারা'আ' বলে। এটি একটি আইন সংক্রান্ত পরিভাষা, এর দ্বারা মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়ার ভিত্তিতে কোন কৃষি জমি লীজ বা ইজারা দেয়া বুঝায়। এই বহুল প্রচলিত মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে জমির মালিক কোন কৃষককে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য তার জমি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এই সময়ের মধ্যে কৃষক ঐ জমিতে বীজ বুনবে, ফসলের পরিচর্যা করবে এবং ফসল কাটবে। জমির মালিক বা কৃষক যে কোন পক্ষই বীজ সরবরাহ করতে পারে। ফসল কাটার পর পূর্ব স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসল ভাগাভাগি হবে, ফসলে জমির মালিকের অংশ হল জমি ইজারা দেয়ার জন্য তার প্রাপ্য খাজনা।[৩]

ইসলামী শরী'আতে বর্গাচাষ বা মুযারা'আ একটি চুক্তি যা উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ প্রদানের শর্তে সম্পন্ন হয়।[৪] অর্থাৎ জমি চাষাবাদকারী যে ফসল উৎপন্ন করবে, তার একটি অংশ ভূমির মালিক পাবে-এই শর্তে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বর্গাচাষ বা মুযারা'আ বলে।[৫]

চুক্তির শর্তাবলী

বর্গাচাষ বা মুযারা'আ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে
২. জমির অবস্থান সুনিশ্চিত এবং চুক্তির মেয়াদে তা চাষের উপযোগী হতে হবে
৩. উক্ত জমিতে কৃষককে অবাধ প্রবেশাধিকার দিতে হবে
৪. চুক্তিতে ইজারা দেয়ার মেয়াদ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা অবশ্যই এক ফসলের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী হতে হবে। যদি নির্ধারিত মেয়াদ শেষেও ফসল না পাকে, তবে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত কৃষক মজুরির অধিকারী হবে এবং এই মজুরী মালিকের প্রাপ্য লভ্যাংশ হতে দেয়া হবে

৫. ভূমি-মালিক ও কৃষকের মধ্যে ফসলের বীজ কে সরবরাহ করবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে
৬. উৎপন্ন ফসলে বা মুনাফায় উভয়ের অংশের হার উল্লেখ করে দিতে হবে
৭. বীজের ধরন ও জাতের নির্দিষ্ট বর্ণনা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে
৮. কোন পক্ষই তার প্রাপ্য মুনাফা বা ফসলের অংশ ইজারায় প্রদত্ত জমির কোন নির্দিষ্ট অংশ হতে নিতে পারবে না।

বীজ বপণের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বীজ-সরবরাহকারী পক্ষ একতরফাভাবে এই ইজারা চুক্তি ভংগ করতে পারবে। তবে অন্যান্য ইজারা চুক্তির ন্যায় এই ইজারা চুক্তি নিম্নবর্ণিত কারণে ভঙ্গ হতে পারে :

চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষের মৃত্যু হলে (যদি অপরিপক্ক ফসল ঐ সময় জমিতে না থাকে; যদি থাকে তবে চুক্তি বলবৎ থাকবে ফসল না পাকা পর্যন্ত; ফসল না পাকা পর্যন্ত এক পক্ষের উত্তরাধিকারীগণ অপর পক্ষকে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারবে না)

আইনসম্মত অজুহাতের মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ হতে পারে, যথা কোন বিচারক যদি দেনা পরিশোধের জন্য উক্ত জমি বিক্রয়ের নির্দেশ দেন।[৬]

জমি চাষ পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার জমি নিজেও চাষ করতে পারে অথবা অপরের দ্বারাও চাষ করাতে পারে। তবে অপরের দ্বারা চাষ করানোর তিনটি পন্থা আছে ঃ

১. শ্রমিক নিয়োগ করে চাষাবাদ করানো। এ ক্ষেত্রে চাষাবাদের সাথে সংশিষ্ট যাবতীয় খরচ জমির মালিক বহন করবে এবং উৎপন্ন সমুদয় ফসল সে লাভ করবে।

২. জমির মালিক বীজ সরবরাহ করবে আর শ্রম, হাল-বলদ ও সার চাষী সরবরাহ করবে। অতঃপর উৎপন্ন ফসল চুক্তি মোতাবেক উভয়ে ভাগ করে নিবে।

৩. জমির মালিক নগদ অর্থের বিনিময়ে তার জমি ইজারা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইজারা হিসাবে দেয় মূল্য পরিশোধ করে ক্রেতা জমি চাষ করে উৎপাদিত ফসলের মালিক হবে।[৭]

বর্গাচাষ প্রথা সম্পর্কে আইনী অভিমত

বর্গাচাষ বা মুযারা'আ বৈধ কি-না এ বিষয়ে ইসলামী আইনবিদদের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ র., ইমাম মুহাম্মদ র. ও ইমাম আহমদ র.-এর মতে বর্গাচাষ বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা র., ইমাম মালিক র. ও ইমাম শাফি'ঈ র. এর মতে বর্গাচাষ প্রথা বৈধ নয়।[৮]

বৈধতার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ

যে সকল ফকীহ বর্গাচাষ বা মুযারা'আকে বৈধ মনে করেন তারা মহানবী স. কর্তৃক খায়বার বিজয়[৯]-এর পর সে এলাকার জমি ইয়াহূদীদেরকে ভাগচাষে প্রদানের ঘটনা নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন :

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর রা. বলেন, মহানবী স. খায়বরবাসীকে উৎপাদিত ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে (খায়বরের জমি) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।[১০]

খ. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর রা. বলেন, মহানবী স. উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বরের জমি ইয়াহূদীদেরকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।[১১]

গ. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর রা. বলেন, মহানবী স. খায়বরের জমি ইয়াহূদীদেরকে এই শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম বিনিয়োগ করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ তারা পাবে।[১২]

ঘ. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর রা. সূত্রে মহানবী স. থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বরের বাগান ও যমীন খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে প্রদান করেন যে, তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে আর মহানবী স. উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবেন।[১৩]

ঙ. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, মহানবী স. বর্গাচাষ প্রথা হারাম করেননি। বরং তিনি পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪]

উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী স. ভাগচাষ করিয়েছেন–নিজের পক্ষ হতে, রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এবং খায়বরের জমির প্রায় পনের শত মালিকের পক্ষ হতেও। এই বন্দোবস্ত তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তাঁর পরের দুই খলিফার যুগেও তা অব্যাহত থাকে। অতএব এর দ্বারা ভাগচাষ বৈধ প্রমাণিত হয়।[১৫]

মহানবী স. হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সেখানকার আনসার মুসলমানগণ তাঁর নিকট আবেদন করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের খেজুর বাগান আছে। আমাদের ও মুহাজির (ভাইদের) মধ্যে তা বণ্টন করে দিন।’ মহানবী স. তা করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে আনসারগণ মুহাজিরগণকে বললেন, ‘আপনারা আমাদের পক্ষ হতে উক্ত বাগানে কাজ করুন এবং আমরা উৎপাদিত ফসলে আপনাদের শরীক করবো।’ মুহাজিরগণ বললেন, আমরা আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিলাম।[১৬]

ইমাম আবূ জা‘ফর র. বলেন, হযরত আবূ বকর রা. তাঁর জমি অর্ধেক ফসল প্রদানের চুক্তিতে বর্গাচাষে প্রদান করতেন।[১৭]

হযরত আলী রা. বলেন, ‘অর্ধেক ফসল প্রদানের শর্তে ভাগচাষ করায় দোষের কিছু নেই।’[১৮]

হযরত তাউস র. বলেন, মুআয ইব্‌ন জাবাল র. মহানবী স.-এর যুগে এবং তাঁর পরে হযরত আবূ বকর রা., হযরত ‘উমর রা. ও হযরত ‘উসমান রা.-এর যুগে তাঁর জমি এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রদানের চুক্তিতে বর্গাচাষে দিতেন।[১৯]

হযরত মূসা ইব্‌ন তালহা র. বলেন, হযরত ‘উসমান রা. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রা., হযরত ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াছির রা. হযরত খাব্বাব ইব্‌নুল আরাত্তি রা. ও হযরত সা‘দ ইব্‌ন মালিক রা.-কে জমি প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও হযরত

সা'দ ইব্‌ন মালিক রা. নিজ নিজ জমি এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রদানের শর্তে বর্গাচাষে প্রদান করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ র., বলেন, বর্গাচাষ বা মুযারা'আ বৈধ। কারণ এতে একজন ভূমির যোগান দেয় ও অন্যজন তার শ্রম বিনিযোগ করে। আর লাভে অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে উভয়েই অংশীদার হয়। তাই বর্গা পদ্ধতিকে সমর্থন না করার কোন কারণ নেই।[২০]

নিষিদ্ধতার যুক্তি-প্রমাণ

যে সকল ফকীহ্ বর্গাচাষ বা মুযারা'আকে অবৈধ মনে করেন তাঁরা হযরত রাফে ইব্‌ন খাদীজ রা., হযরত জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা., হযরত আবূ হুরায়রা রা., হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা., হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রা. এবং হযরত সাবিত ইব্‌ন দাহ্হাক রা. হতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন।[২১] নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো :

১. হযরত রাফে ইব্‌ন খাদীজ রা. বলেন, আমরা মহানবী স. এর সময়ে জমির মুহাকালা করতাম এবং এক-তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য শস্যের বিনিময়ে ইজারা দিতাম। একদিন আমার এক চাচা এসে বললেন, মহানবী স. আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে বারণ করলেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স.-এর অনুসরণ আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। মহানবী স. আমাদেরকে জমি বর্গাচাষ দিতে এবং এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নিজে চাষ করতে বা অন্যের দ্বারা চাষ করাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইজারা ইত্যাদি দিতে অপছন্দ প্রকাশ করেছেন।[২২]
২. জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, মহানবী স. জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন।[২৩]
৩. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন, যার জায়গা জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে কিংবা তার কোন ভাইকে (চাষ করতে) দেয়। যদি এটাও না করতে চায় তাহলে যেন তা নিজের কাছে রেখে দেয়।[২৪]
৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, মহানবী স. মুযাবানা ও মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুযাবানা হলো খেজুর গাছের মাথার ঝুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকালা হলো জমি ইজারা দেয়া।[২৫]
৫. হযরত সাবিত ইব্‌ন দাহ্হাক রা. বলেন, মহানবী স. মুযারা'আত (ভাগচাষ) নিষিদ্ধ করেছেন।[২৬]
৬. হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, মহানবী স. মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও খাওয়ার যোগ্য হবার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২৭]

৭. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, মহানবী স. মুহাকালা ও মুযাবানা নিষিদ্ধ করেছেন।[২৮]

৮. ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, খায়বরের চুক্তিকে কোনভাবেই বর্গা বলা যায় না। তিনি তাঁর অভিমতের সপক্ষে বলেন, নির্ভরযোগ্য হাদীসে দেখা যায় যে, মহানবী স. অর্ধাংশ শস্যের বিনিময়ে বর্গা দেয়ার পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এর বিপরীতে যে সমস্ত হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াহূদী কৃষকগণ ভূমিহীন শ্রমজীবী ছিল। তাদের সাথে বর্গাচুক্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ দেয়া হয় এবং তাদের খাওয়া পরার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ইয়াহূদীরা জমি চাষ করতো এবং খাওয়া পরার জন্য ফসলের অর্ধেক নিতো। এটা ঠিক বর্গাচাষ ছিল না।

সকল ফটকাবাজী ইসলামে নিষিদ্ধ। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেককে কোন পরিমাণ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। ফসল আদৌ হবে কিনা এবং হলে কতখানি হবে, এসব ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় একে 'গারার'[২৯] বলা হয়। 'গারার' ইসলামী আইনে বৈধ নয়।

বর্গা পদ্ধতি যেসব কারণে গ্রহণযোগ্য নয়

ক. নীতিগতভাবে 'গারার' আইনসিদ্ধ নয়। ফিক্‌হ শাস্ত্র মতে প্রতিষ্ঠিত নীতির সাথে গরমিল হলে হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না।

খ. কৃষকগণকে যে পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যবস্থা এ পদ্ধতিতে দেখা যায়, তা অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত। অথচ অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম-ব্যবহার সিদ্ধ নয়।

এই চুক্তি মোতাবেক কাঁচা ফলেরও ভাগ বাটোয়ারা হতে পারে। কিন্তু ইসলামী নীতি অনুযায়ী ফল ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বিলি বন্টন করা সমীচীন নয়।[৩০]

ইমাম শাফি'ঈ র. বলেন, কোন ব্যক্তি যদি একটি খেজুর গাছ বা আঙ্গুরের বাগান কৃষককে এ শর্তে আবাদ করতে দেয় যে, কৃষক উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ দিবে, তবে এ চুক্তিকে মুসাকাত[৩১] বলা হয়। মুসাকাত চুক্তি জায়েজ এ কারণে যে, মহানবী স. খায়বরে এরূপ চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু কেউ যদি এক খণ্ড খালি জমি কৃষককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয়, তবে তা হবে অবৈধ। কারণ এ পদ্ধতি হচ্ছে মুহাকালা, মুখাবারা অথবা মুযারা'আ।'[৩২]

ইমাম ইব্‌ন হাজম[৩৩] র. বলেন, মহানবী স. তদানিন্তন যুগে কোন এক পর্যায়ে প্রচলিত প্রথাভিত্তিক সকল প্রকার রায়তি এবং বর্গা পদ্ধতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রমের বিনিময়ে খায়বরে তিনি জমি চাষাবাদের জন্য কৃষকদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। আইনের দৃষ্টিতে খায়বরের চুক্তি একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। অর্থের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করানো একারণে সমর্থন করা যায় না যে, তাতে কৃষকদের ক্ষতি হয় বেশী। যে মওসুমে ফসল হয় না, সে মওসুমে ভূমি চাষাবাদ বাবদ ভূমির মালিককে অর্থ দিতে হলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতি সমর্থনযোগ্য নয়।

তবে ইবনে হাজমের মতে বর্গাচাষ প্রথা জায়েয। তিনি বলেন, উৎপন্ন ফসলের অংশের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করা হলে তাতে ভূমির মালিক বা কৃষক কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং এতে ভূমির মালিক এবং কৃষক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তিনি আরও বলেন, খাজনার বিনিময়ে জমির চাষ নিষিদ্ধ। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের অংশের বিনিময়ে জমির চাষাবাদ নিষিদ্ধ নয়। খায়বরে মহানবী স. নিজে এবং পরবর্তীকালে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর রা. এভাবে জমি চাষাবাদ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর রা. ও কিছুকাল এ প্রথা বলবৎ রাখেন।[৩৪]

দ্বন্দ্বের সমাধান

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বর্গাচাষ প্রথা বৈধ কি-না সে বিষয়ে পরস্পর বিরোধী যে অভিমত রয়েছে তার মধ্যে সমন্বয় করা যায় এভাবে-

ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আহমদ র. প্রমুখের মত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভূমিস্বত্ব ভোগ করার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। কাজেই কোন জমির মালিক বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু বা স্ত্রীলোক হওয়ায় যদি নিজে জমি চাষ করতে না পারে অথবা নিজে চাষ করতে না চায় তাহলে সে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে পারে। আর এটাই হচ্ছে ইসলাম স্বীকৃত পদ্ধতি।[৩৫] এ প্রসঙ্গে মহানবী স. বলেছেন, 'যার অতিরিক্ত জমি আছে, তা হয় সে নিজে চাষ করবে, না হয় সে তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে।[৩৬] বস্তুত অপরের দ্বারা ভূমি চাষ করানো ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে অবৈধ বা শোষণমূলক ব্যবস্থা নয়। কেননা মহানবী স. এবং তাঁর অসংখ্য সাহাবী অপরের দ্বারা ভূমি চাষ করিয়েছেন।[৩৭]

মহানবী স. খায়বরের বিজিত বিরাট এলাকার অর্ধেক জমি রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন এবং বাকী অর্ধেক বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে ছিলেন। মুজাহিদগণ নিজ নিজ অংশের বৈধ মালিক হয়েছিলেন। অতঃপর এই উভয় ধরনের জমিকে খায়বরের বংশানুক্রমিক কৃষক (ইয়াহূদী)-দের নিকট পারস্পরিক ভূমি চাষের শর্তে সোপর্দ করা হয়। মহানবী স. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাদের সাথে সমস্ত ফসলের অর্ধেক দানের শর্তে ভূমি চাষের চুক্তি করেছিলেন।[৩৮] এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, হযরত 'উমর ফারূক রা. খায়বরে প্রাপ্ত তাঁর নিজের অংশের জমি বর্গাচাষের ভিত্তিতেই ভোগ করেছিলেন। আর অপরাপর সাহাবাগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের মালিক ছিলেন। তাদের কেউ তাদের নিজ অংশের জমি চাষ করেননি, বরং ইয়াহূদীদেরকে অর্ধেক ফসল দানের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। হিজরতের পর আনসারগণ মুহাজিরগণের মধ্যে জায়গা-জমি বন্টন করে দেয়ার প্রস্তাব করলে মহানবী স. তা করতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর আনসারগণ মুহাজিরগণের সাথে 'পারস্পরিক শ্রম ও জমির বিনিময় ভিত্তিক কৃষিনীতি' অনুসারে কাজ করার চুক্তি করেন।[৩৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচাষ বৈধ হবে কেবল তখনই যখন কৃষক কিংবা জমির মালিক কোন পক্ষের ক্ষতির আশংকা না থাকবে। হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন,"মহানবী স. বর্গাচাষ প্রথা নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি একে অপরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪০]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বর্গাচাষকে বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা র., ইমাম মালিক র. ও ইমাম শাফিঈ র. প্রমুখের অভিমত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামে বর্গাচাষ বৈধ নয়। তাঁরা যুক্তি দিয়ে বলেন, বর্গা প্রথার মাধ্যমে একদিকে যেমন এক শ্রেণীর শ্রমবিমুখ, শোষক ও আয়েশী শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে জমির মালিক মালিকানার দোহাই দিয়ে চাষীর শ্রমলব্ধ উৎপন্ন ফসলের বেশীর ভাগ হাতিয়ে নেয়। এতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই মহানবী স. চাইতেন ভূমির মালিকরাই যেন তাদের জমি চাষ করে।[৪১]

মোটকথা যদি কোন জমির মালিক তার জমি চাষ করাতে গিয়ে এমন শর্ত আরোপ করে, যা চাষীর পক্ষে পালন করা অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে জমির মালিকের দেয়া সকল শর্ত মেনে নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে, এমতাবস্থায় তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থেকে যায় এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কারণ জমির মালিক তার ইচ্ছা অনুযায়ী চাষীকে ফসল দিয়ে থাকে। এটা সুস্পষ্ট যুলুম। ইসলাম কখনও এ ধরনের যুলুমের প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম দুর্বল, অসহায়, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাকে অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। তাই যে ভূমি ব্যবস্থা শ্রমিককে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত করে এবং অভাবগ্রস্তকে আরো বিপদের দিকে ঠেলে দেয় সেই ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই যুক্তিসংগত। মানুষকে এ থেকে বিরত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

পক্ষান্তরে, জমির মালিক ও চাষী যখন সহানুভূতিশীল মন নিয়ে ভূমি ও শ্রমের অনুপাতে আপন আপন অংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায়, একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন রকমের অসৎ অভিপ্রায় না রাখে, সর্বোপরি পরিবেশের চাহিদা যদি বর্গা চাষের অনুকূল হয়, এমতাবস্থায় বর্গাচার অনুমোদনযোগ্য।[৪২]

যেসব কারণে বর্গা চুক্তি অবৈধ গণ্য হয়

নিম্নলিখিত কারণে বর্গাচাষ বা মুযারা'আ চুক্তি অবৈধ গণ্য হয় তা নিম্নরূপ:

১. জমি উভয় পক্ষের, তবে এক পক্ষ তার সাথে বীজ এবং অপর পক্ষ কৃষি-উপকরণ প্রদান করলে।

২. ভূমির মালিক জমি প্রদান করবে এবং একাধিক চাষীর ক্ষেত্রে একজন বীজ, একজন কৃষি-উপকরণ এবং শ্রম প্রদান করলে।

৩. ভূমির মালিক জমি প্রদান করবে এবং একাধিক চাষীর ক্ষেত্রে একজন বীজ এবং অপরজন কৃষি-উপকরণ ও শ্রম প্রদান করলে।
৪. ভূমির মালিক জমি ও শ্রম এবং অপরপক্ষ বীজ ও কৃষি-উপকরণ প্রদান করলে।
৫. ভূমির মালিক জমি, উভয় পক্ষ (ভূমির মালিক ও চাষী) বীজ এবং ভূমির মালিক ব্যতীত অন্য কেউ শ্রম প্রদান করলে।
৬. চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একপক্ষ উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে অথবা উভয় পক্ষ নির্দিষ্ট অংশ পাবে অথবা উভয় পক্ষ নির্দিষ্ট হারে যা পাবে তাদের মধ্যে এক পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত পাবে অথবা এক পক্ষ সংশিষ্ট জমিতে উৎপন্ন ফসল ব্যতীত অন্য কিছু পাবে।
৭. চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একপক্ষ বীজ এবং অপর পক্ষ জমি, কৃষি-উপকরণ ও শ্রম প্রদান করলে।
৮. ভূমির মালিক ও কৃষক যৌথভাবে বীজ প্রদান করলে।
৯. ভূমির মালিক জমি, চাষীপক্ষ বীজ ও কৃষি-উপকরণ এবং চাষী ও মজুর পক্ষ শ্রম প্রদান করলে।[৪৩]

উপরোক্ত কোন কারণে মুযারা'আ চুক্তি ফাসিদ গণ্য হলে চুক্তি কার্যকর করা বাধ্যতামূলক নয়। এই ক্ষেত্রে ভূমির মালিক বীজ প্রদান করলে সে চাষীকে তার শ্রমের উপযুক্ত মজুরী প্রদান করে উৎপন্ন ফসল নিতে পারে। চাষী বীজ প্রদান করে থাকলে সে ভূমির মালিককে জমি চাষাবাদকালের জন্য উপযুক্ত ইজারা প্রদান করে ফসল নিতে পারে। ভূমির মালিক কৃষি উপকরণ প্রদান করে থাকলে চাষী তাকে তার ভাড়া প্রদান করবে। চাষাবাদ করা সত্ত্বেও জমিতে ফসল উৎপন্ন না হলেও চাষী তার শ্রমের উপযুক্ত মজুরী পাবে। ফসল নির্দিষ্ট হারে (যেমন অংশ ইত্যাদি) ভূমির মালিক ও চাষীর মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি এরূপ চুক্তি করা হয় যে, যত পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হোক ভূমির মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন বিশ মণ, এক শত মণ ইত্যাদি) পাবে এবং অবশিষ্ট ফসল চাষী পাবে, তবে তা বৈধ হবে না।[৪৪]

উপসংহার

ইসলামে ভূমি অনাবাদি রাখা নিন্দনীয়। যার জমি আছে সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা অন্যের দ্বারা করাবে কিংবা তার কোন ভাইকে নি:স্বার্থভাবে তা চাষাবাদ করতে দিবে এটাই ইসলামের বিধান। সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, ফসলের কোন নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে পারস্পরিক কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কিংবা বৃদ্ধ, পঙ্গু, অনাথ, শিশু ও বিধবা স্ত্রীলোক যারা ভূমির মালিক হয়েও ঠিকমত জমি চাষ করতে পারে না। ফলে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যায়। আর অন্যদিকে অনেক কর্মক্ষম

লোকের ভূমি না থাকায় অথচ দক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করার সুযোগ পায় না। এতে সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাই ইসলামে মুযারা'আ বা বর্গাচাষকে বৈধ রাখা হয়েছে যাতে উভয়েই উপকৃত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, মুযারা'আ বা বর্গাচাষ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে বৈধ। আরো বলা যায় যে, প্রস্তাবিত বিষয়গুলো অনুসরণে দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বাংলাদেশের কৃষিজীবী ও ফসলী জমির মালিক এবং সরাসরি জমিগুলোকে চাষাবাদে ইসলামী বর্গাচাষ নীতি বাস্তবায়ন করা গেলে বর্গচাষীগণ বেশি উপকৃত হবেন। সেই সাথে ইসলামী বিধান পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই অফুরন্ত সওয়াব ও বরকতের অধিকারী হবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অধ্যাপক এম,এ,সামাদ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, ফরিদপুর : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ.১৪৭-১৪৮।

২. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার মন্ডল ও ড. শামছুল আলম মোহন, কৃষি অর্থনীতি, স্কুল অভ্ এগ্রিকালচার এন্ড রুর‍্যাল ডিভেলপ্মেন্ট, গাজিপুর : বাংলাদেশ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮, পৃ.১১।

৩. শায়খ ফজলুর রহমান, 'মুযারা'আ' ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২০৯।

৪. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বাক্র আল ফারগানী আল মারগীনানী, আল-হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী : কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪০৮।

৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ.৬৪৫।

৬. শায়খ ফজলুর রহমান, 'মুযারা'আ' ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ২০৯-১০।

৭. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খ., ২য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৫-৪৬।

৮. মুহাম্মদ মূসা, 'মুযারা'আ' ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

৯. 'খায়বর বিজয়'– হিজরী ৭ সালে {৬২৮-৬২৯ খ্রি} মহানবী স.-এর নেতৃত্বে আরবের মরুদ্যান খায়বার বিজিত হয়। সেকালে খায়বর ৭ টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে ঃ ১.নাঈম, ২.আবূ আল-হুকায়েক, ৩.শিক্ক, ৪.নাতাত, ৫. ওয়াতিহ, ৬. সুলালিম, ৭. কাতিবা।

ইমাম শায়বানী বলেন, 'এই কৃষককুল যদিও ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল তবুও তাদের কোনভাবে ক্রীতদাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। শায়বানী আরো বলেন যে, খায়বরের এ সকল মানুষ ছিল মুহাদা অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে শায়বানী কর্তৃক উল্লেখিত একটি হাদিস খুবই প্রাসঙ্গিক ঃ চুক্তি সম্পাদনের পর কয়েকজন মুসলমান ঐ জমির মধ্যে প্রবেশ করে এবং কিছু শাক-সবজী নিয়ে যায়। মহানবীর স.-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি ঘোষণা করেন, মুহাদিন অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ লোকদের সম্পদ মুসলমানগণ নিতে পারে না; চুক্তির মধ্যে যেটুকু আছে, সেই-টুকুই মাত্র নেবার অধিকার তাদের আছে।' মূলত খায়বরের জমির ফসলের অধিকার ইয়াহুদী কৃষকদের ছিল। এই কৃষকদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি শর্তের বাইরে এক কপর্দকও মুসলমানদের নেয়ার অধিকার ছিল না। (গাজী শামছুর রহমান, বর্গা বা মুযারা'আ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৮৪, পৃ.২৯)।

১০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ.৩১৩ ।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত,পৃ.৩১৪।

১৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যা, তা.বি., পৃ.১৩।

১৪. আবূ ঈসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা, জামে আত তিরমিযী, ১ম খ., দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যা, তা.বি., পৃ.২৫৮।

১৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৮।

১৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২।

১৭. আবূ জা'ফর আহমদ আততাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার, ৩য় খণ্ড, লেবানন : তা.বি., পৃ.৬৭।

১৮. আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইব্‌ন হুসামুদ্দীন আল-হিন্দী আল বুরহানপুরী, কানযুল উম্মাল, ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, ১৫শ খণ্ড, আলেপ্পো : ১৩৭৯/১৯৬৯, পৃ. ৫৩৪।

১৯. হাফেজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাযাহ আল-কাযবীনী, সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, ২য় খণ্ড, দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়া, তা.বি., পৃ.১৮০।

২০. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি., পৃ ৩৫।

২১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাসয়ালাহ্ মিলকিয়াতে যমীন (ভূমির মালিকানা বিধান), (অনু ঃ এ.বি.এম.এ.খালেক মজুমদার), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ.৪৫।

২২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৩. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৫ ।

২৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

২৮. সুলায়মান ইব্নুল আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনান আবূ দাউদ, দিল্লীঃ মাকতাবাহ রশীদিয়্যা, তা.বি., পৃ.৪৮৩।

২৯. 'গারার'– সাধারণভাবে 'গারার' বলতে অনিশ্চিত ঝুঁকি বুঝায়। এর মধ্যে জুয়া বা ফটকাবাজীর ভাবও আছে। ফকীহ্গণ গারার বলতে তিন প্রকার বিক্রয় নির্দেশ করেছেন,

ক. যে জিনিস বিক্রয়ের মুহূর্তে মওজুদ নেই, সে জিনিস বিক্রয় করা।

খ. যে জিনিসের ভবিষ্যৎ ফল জানা নেই, সে জিনিস বিক্রয় করা।

গ. যে বিক্রয়ের বিষয়বস্তু এমন যে তা পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও নিশ্চয়তা নেই।

এ রকম আদান-প্রদান ইসলামী ন্যায়নীতি সমর্থন করে না। (গাজী শামছুর রহমান, 'ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-মার্চ-১৯৮৫, পৃ.৫৯)।

৩০. গাজী শামছুর রহমান, বর্গা বা মুযারা'আ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৮৪, পৃ.৩০-৩১।

৩১. 'মুসাকাত'–একটি আইনগত পরিভাষা, এবং শাব্দিক অর্থ পানিসেচ। নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভাগাভাগির ফলের বাগান এক মৌসুমের জন্য ইজারা দেয়া। চুক্তি অনুযায়ী কৃষক ফলের বাগানের পরিচর্যা করে এবং মওসুম শেষে ফল বা ফললব্ধ আয় পূর্ব নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়া। মালিকের অংশ তার রাজস্বরূপে গণ্য হয়। মুসাকাত চুক্তি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুযারা'আ চুক্তির মতই, তবে ফসলী জমি বর্গা দেয়াকে মুযারাআ

বলে। যেমন-

ক. মুসাকাত চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই তা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

খ. মুসাকাতে নির্ধারিত মেয়াদ ফল পাকার পূর্বেই শেষ হলে কৃষককে ফল পাকা পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে ফল বাগানের পরিচর্যা করতে হবে।

গ. খামারের মালিকানা হস্তান্তরিত হলে যদি তৃতীয় পক্ষ বৈধভাবে মালিকানার দাবি করতে পারে আর গাছগুলোতে যদি ফল এসে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে কৃষক যতদিন ধরে সে কাজ করছে, ততদিনের মজুরি দাবি করতে পারে এবং

ঘ. মুসাকাতের বৈধতার জন্য চুক্তির মেয়াদের ঘোষণা আবশ্যকীয় শর্ত নয়। ইজারার অন্যান্য চুক্তির ন্যায় এই চুক্তিও নাকচ হতে পারে। কেননা,

ক. যে কোন পক্ষের মৃত্যুতে (কিন্তু যদি গাছে সেই সময় কাচা ফল থাকে, তাহলে কৃষক অথবা তার উত্তরাধিকারী ফল পাকার সময় পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে ক্ষেতের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে বাধ্য) অথবা

খ. বৈধ ওজর থাকিলে। (আহমাদ আবুল ফাত্হ, কিতাবুল মু'আমালাত ফি'শ-শারী'আতি'ল ইসলামিয়্যা ঃ ওয়া'ল কাওয়ানীনিল মিসরিয়্যা, কায়রো : ১৩৪১/১৯২২, ২ খ., পৃ.৪৬১-৬৫)।

৩২. গাজী শামছুর রহমান, বর্গা বা মুযারা'আ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২।

৩৩. 'ইমাম ইব্ন হাজম'-ইমাম ইব্ন হাজম র.-এর পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ আলী ইবন্ আহমদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাযম। রমজানের শেষ দিন ৩৮৪/৭ নভেম্বর, ৯৯৪ সনে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসের বিখ্যাত আরব কবি, ঐতিহাসিক, আইনবিদ, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আরব মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তিনি জাহেরী নীতিমালা সংকলন করেন এবং সেগুলোর প্রক্রিয়া কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তিনি ৮০ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ৪শ' টি বই লিখেছেন। এর মধ্যে অন্যতম-ইসলামী আইন, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। তিনি সেভিলের নিকটবর্তী মানতা গ্রামে লীশামে ৪৫৭/১০৬৪ সালে ইন্তিকাল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হুমায়ূন খান, 'ইব্ন হায্ম', ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ.২২২-২৩৭)।

৩৪. গাজী শামছুর রহমান, বর্গা বা মুযারা'আ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২।

৩৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৯।

৩৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৫।

৩৭. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৩৮. প্রাগুক্ত,

৩৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩।

৪০. আবূ ঈসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা, জামে আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, তা.বি., পৃ.২৫৮।

৪১. অধ্যাপক এম.এ.সামাদ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯-৫০।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭-৫৮।

৪৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫৪-৫৫।

৪৪. মুহাম্মদ মূসা, 'মুযারা'আ', ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২১১।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ১০২-১২৪

ইসলামী আইনে বিবাহ ও তালাক প্রসঙ্গ তালাকের অপব্যবহার ও কথিত হিল্লা বিবাহ

আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন মানুষের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে বিভ্রান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে ধসিয়ে দেয়া হচ্ছে। সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর ব্যাপারে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মানুষকে পরিণত করা হচ্ছে কেবলই ভোগবাদী জীবে। অবস্থা এমন যে, মুসলিম সমাজের ভিত এখন ভেতর ও বাইরে থেকে হুমকির সম্মুখীন।

মুসলিম সমাজে দাম্পত্য জুটি একটি মৌলিক ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ মুসলমানদের এই মৌলিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জোরালো অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় এ বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

বিবাহের সংগা

বিবাহ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'নিকাহ'। আরবী নিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ মিলানো, একত্র করা এবং সহবাস করা।[১] ফিকহের পরিভাষায় নিকাহ হলো এমন ব্যবস্থা যা দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈধ দাম্পত্য জীবনের সূচনা করে।[২]

বিবাহ আল্লাহ ও রসূল স. নির্দেশিত একটি ব্যবস্থা

দাম্পত্য সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার কাঙ্ক্ষিত ও নির্দেশিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। দম্পতির মেলামেশা ও পরিবার গঠন মনুষ্য সমাজের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়ে উদ্ভূত বিষয় নয়। মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই দাম্পত্য সম্পর্ক অস্তিত্ব লাভ করেছে। মানব জাতি দম্পতিরই সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল ধর্মের লোকেরাই বাবা আদম আ.-কে আদি পুরুষ এবং মা হাওয়াকে আ.-কে আদি মা বলে স্বীকার করে। মহান আল্লাহ কুরআনুল করীমে এ কথাটিই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালক (রব)-কে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একমাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং এই দুইজন থেকে সৃষ্টি

লেখক : রিসার্চ অফিসার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

করেছেন অসংখ্য নর-নারী।'[৩] দাম্পত্য সম্পর্ককে আল্লাহ তাআলা চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জীবনসঙ্গিনী, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিশ্চয়ই এতে বহু নির্দশন রয়েছে।'[৪]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা যেন বিবাহ করে।' বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত অস্বীকার করে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৫]

রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিবাহ করলো সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো।[৬]

বিবাহের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

অভিভাবকদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের অধীনস্ত এবং আজ্ঞাবহদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আল্লাহ তাআলা এও বলেছেন, তারা যদি দরিদ্র থাকে তবে বিবাহের পর আল্লাহর দয়ায় তারা বিত্তশালী হয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (যে পুরুষের স্ত্রী নেই বা যে নারীর স্বামী নেই, যে পুরুষ বিপত্নিক, যে নারী বিধবা, কিংবা অবিবাহিত) তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।[৭]

হযরত উমর র. বলেন, 'আমি বিস্মিত হই বিবাহ ছাড়া যে ব্যক্তি প্রাচুর্য প্রত্যাশা করে'।[৮]

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও উম্মাহর সর্বসম্মত মত হলো, মুসলমানের জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'নারীদের মধ্যে তোমাদের যাকে ভালো লাগে তাকে বিবাহ করো।'[৯] 'এবং তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই তাদের বিবাহ করিয়ে দাও'।[১০]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা যেন বিবাহ করে'।[১১]

বিবাহের গুরুত্ব ও কল্যাণ

১. মানব বংশধারা বজায় রাখা।

২. দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখা।

৩. এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করা।[১২]

ধর্মীয় অনুশাসন পালনেই শুধু বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের জ্ঞান ও জৈবিক চাহিদাও বিবাহের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, বিবাহের প্রতি রসূললুল্লাহ স. এর নির্দেশ এবং

ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মত রায় বিবাহের প্রতি উৎসাহ যোগায়। তদ্রূপ মানুষের স্বভাবজাত প্রত্যাশা থাকে দুনিয়াতে তার কোন না কোন উত্তরসুরি থাকুক, যার মাধ্যমে সে দুনিয়াতে স্মরণীয় হবে। বংশানুক্রমিক উত্তরসুরি রেখে যাওয়ার চেয়ে একজন মানুষের জন্যে দুনিয়াতে স্মরণযোগ্য হওয়ার উত্তম আর কোন পন্থা নেই। তাছাড়া প্রতিটি সৃষ্টি জীবের মধ্যে তার স্বভাবজাত জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকে। এবং বিপরীত লিঙ্গের সাথেই সৃষ্টিজীবের জৈবিক চাহিদা পূর্ণ হয়ে থাকে। মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা তাই তার জৈবিক চাহিদা পূরণ আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা বিবাহের মাধ্যমেই হতে হবে এর কোন বিকল্প নেই।

ইমাম সারাখসী বলেন, বিবাহের মধ্যে দীন ও দুনিয়া উভয়বিধ উপকারিতা রয়েছে।

১. নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নৈতিক সুরক্ষা মজবুত হয়।

৩. এবং বৈধ সন্তান জন্মানোর মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে।

ইমাম সারাখসী আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীকে মানুষের মাধ্যমে আবাদ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমেই সাধারণত মানুষ জন্মলাভ করে। আর এই মিলন প্রক্রিয়া বিবাহের মাধ্যমে করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। বিবাহ ছাড়া যদি শিশু জন্মদান ব্যাপকতা লাভ করে, তাহলে মানুষের জন্ম পরিচিতির বিলুপ্তি ঘটবে এবং মানুষ ও পশুর মতোই স্বকীয়তা হারাবে। আদর্শিক, ভৌগোলিক ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র পরিচয় বলতে দুনিয়াতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[১৩]

ফকীহগণের মতে বিবাহের পাঁচটি পর্যায় রয়েছে :

ক. যে অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব।

খ. যে অবস্থায় বিবাহ করা মুস্তাহাব।

গ. যে অবস্থায় বিবাহ করা মাকরূহ।

ঘ. যে অবস্থায় বিবাহ করা হারাম।

ঙ. যে অবস্থায় বিবাহ করা মুবাহ।

ক. বিবাহ করা ওয়াজিব : ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, যদি কারো পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে কিছুতেই সে নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখতে না পারে তবে তার জন্যে বিবাহ করা ওয়াজিব। কারো অবস্থা যদি এমন সঙ্গিন হয়ে ওঠে যে, সঙ্গম ব্যতীত তার পক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে। তখন তার বিবাহ করা ফরয। কারণ বিবাহ না করলে সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তবে বিবাহ ওয়াজিব ও ফরয হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো, স্ত্রীর খোরপোষ এবং মহর দেয়ার সামর্থ্য তার থাকতে হবে এবং স্ত্রীর উপর কোন ধরনের জুলুম করতে পারবে না। কারণ জুলুম করা হারাম,

অন্যের উপর জুলুম বান্দার হক বিনষ্টের অপরাধ। আর চারিত্রিক স্খলনজনিত অপরাধ আল্লাহর হক বিনষ্টের অপরাধ হিসাবে গণ্য। বান্দার হক আর আল্লাহর হক একত্র হলে বান্দার হক রক্ষা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। কেননা, মহামহীম আল্লাহ্ তাঁর হক ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু বান্দার হক তিনি মাফ করেন না।[১৪]

খ. সুন্নত বা মুস্তাহাব : হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, বিশুদ্ধ মতে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। এই সুন্নতকে কেউ কেউ মুস্তাহাবও বলে থাকেন। বিবাহ করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় বিবাহ না করলে গোনাহ্গার হতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'বিবাহ আমার সুন্নত।[১৫] তিনি আরো বলেন, যে আমার সুন্নতকে পরিহার করে সে আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৬] সুন্নত এজন্য যে, রসূলুল্লাহ্ স. নিজে বিবাহ করেছেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামও বিবাহ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, বিবাহ নবীগণের সুন্নত। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত প্রায় সকল নবী রসূল বিবাহ করে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন।

গ. মাকরূহ : কারো মধ্যে যদি স্ত্রীর হক পুরোপুরি আদায় করার সামর্থের ব্যাপারে সংশয় থাকে, কিংবা স্ত্রীর উপর কোন ধরনের জুলুমের আশংকা থাকে তবে তার জন্যে বিবাহ করা মাকরূহ (অবাঞ্ছনীয়)। কেননা বান্দার হক আল্লাহর হকের উপর অগ্রগণ্য।

ঘ. হারাম : কারো বেলায় যদি নিশ্চিত এমন আশংকা হয় যে, তার দ্বারা স্ত্রীর উপর জুলুম হবে তখন তার জন্য বিবাহ করা হারাম। কেননা বিবাহ একটি পুণ্য ও সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে সওয়াবের বিপরীতে তার দ্বারা আরো কঠিন গোনাহর কাজ সম্পন্ন হওয়াটা নিশ্চিত। অতএব বড় গোনাহ্ পরিহার করতে বিবাহ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

ঙ. মুবাহ : যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর উপর আরোপিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে কিছুটা সংশয় থাকে কিন্তু সেই সংশয় এতোটা প্রবল নয়, বরং সংশয় সত্ত্বেও সে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় এমতাবস্থায় তার জন্যে বিবাহ করা মুবাহ তথা বৈধ।[১৭]

বিবাহের বৈশিষ্ট

বিবাহের বৈশিষ্ট দু'টি।

এক. বিবাহ হবে স্থায়ী, স্থিতিশীল এবং জীবনের জন্যে। সাময়িক, অস্থায়ী কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ জায়েয নেই।

দুই. বিবাহের পর উভয়কেই পরস্পরের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সম্মত থাকতে হবে। বিবাহকে কোন অবস্থাতেই জৈবিক চাহিদা পূরণের অবলম্বন বানানো যাবে না।

বিবাহের রুকন (ভিত্তি)

হানাফী ফকীহদের মতে বিবাহের রুকন দু'টি– ইজাব ও কবুল।

হাম্বলী মতাবলম্বীদের মতে বিবাহের রুকন তিনটি– পাত্র-পাত্রী, ইজাব ও কবুল।

ব্যাখ্যা : বিবাহের আকদ (চুক্তি) সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রীর পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয় এই প্রস্তাবকে বলা হয় ইজাব। আর প্রস্তাবের বিপরীতে অপর পক্ষ থেকে যে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় তাকে বলা হয় কবুল।

বিবাহের শর্তাবলী

এক. ইজাব ও কবুল সম্পর্কে পাত্র-পাত্রীকে অবশ্যই সজ্ঞান, সমঝদার ও প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। পাগল ও অবুঝ বালক-বালিকার ইজাব কবুল সহীহ হবে না।

দুই. পাত্র-পাত্রীর মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক থাকতে পারবে না, ইসলামী শরীয়তে যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম।

তিন. ন্যূনতম দু'জন মুসলিম পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্যতেও বিবাহ সম্পন্ন হবে। সাক্ষীগণকে অবশ্যই মুসলিম, বালেগ ও জ্ঞানী হতে হবে।

চার. উভয় সাক্ষীকেই ইজাব ও কুবল বাক্য পরিষ্কার শুনতে হবে।

পাঁচ. ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে।

ছয়. পাত্র-পাত্রী নির্দিষ্ট হতে হবে। অনির্দিষ্ট পাত্র-পাত্রীর বিবাহ সহীহ হবে না।

সাত. পাত্রী প্রাপ্তবয়স্কা হলে তার পরিষ্কার সম্মতি থাকতে হবে। তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ সহীহ হবে না।

বিবাহের কার্যকারিতা এবং বিবাহ পরবর্তী পালনীয় কর্তব্য

সহীহভাবে বিবাহ সম্পন্ন হবার পর স্বামী ও স্ত্রীর উপর যৌথভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে কিছু পালনীয় কর্তব্য বর্তায়, যেগুলো পালন করা উভয়ের জন্য জরুরি।

এক. যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য পালনীয়

ক. উভয়েই উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাকে ওয়াজিব বলেছেন। সৎ ব্যবহার হলো, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি খেয়াল রাখবে যাতে তার কোন কথা, কর্ম বা ব্যবহারে অপর জন কষ্ট না পায়। একজন অপরজনকে খুশি করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবে তাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করবে না। প্রত্যেকেই পরম আগ্রহ, উৎসাহ ও খুশি মনে জীবনসাথীর সেবা করবে। কেননা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, 'আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[১৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, (পুরুষের উপর) নারীদেরও তেমন অধিকার আছে যেমন (নারীদের উপর) পুরুষের অধিকার আছে।[১৯]

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সার্বক্ষণিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, নিকটআত্মীয় ও এতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো।[১৪] উক্ত আয়াতে পার্শ্বসাথী দ্বারা অধিকাংশ আলেমদের মতে জীবনসঙ্গীকেই বুঝানো হয়েছে। ইবনুল জাওযী র. বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার থাকা উচিত, নয়তো উভয়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। স্ত্রী স্বামীকে বেশি ভয় পাওয়ার মতো অবস্থাও যেমন থাকা উচিত নয়, তদ্রূপ স্বামীর জন্যেও স্ত্রীকে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য অবস্থানে রাখা ঠিক নয়।[২১]

খ. স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার (ওয়ারিসী স্বত্ব) লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান (অবস্থায় মারা যায়) হয় তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। সন্তান থাকলে, যে অসিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার এবং তোমাদের ঋণ পরিশোধ করার পর স্ত্রীরা আট ভাগের এক ভাগ পাবে।[২২]

গ. উভয়ের ক্ষেত্রে হুরমতে মুসাহারা কার্যকরী হবে। অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর পিতা, পিতার পিতা এবং তদূর্ধ পুরুষ এবং স্বামীর ছেলে, ছেলের ছেলে বা নিম্ন কাউকে বিবাহ করতে পরবে না। একইভাবে স্বামী স্ত্রীর মা, মায়ের মা, কন্যা, কন্যার কন্যা, স্ত্রীর ফুফু, খালা এবং স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় বোনকে বিবাহ করতে পারবে না।

ঘ. সন্তানের পিতৃত্ব তথা বংশধারা প্রমাণিত হবে। সহীহ বিবাহের পর স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান আসবে সেই সন্তান স্বামীর ঔরসজাত বলে সাব্যস্ত হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'যার বিছানা সন্তান তার।'[২৩]

দুই. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

বিবাহের পর স্ত্রীর যেমন স্বামীর উপর কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্রূপ স্ত্রীর উপর স্বামীরও অধিকার সাব্যস্ত হয়, যেসব অধিকার মেনে নিতে স্ত্রী আইনত বাধ্য।

ক. স্ত্রী স্বামীর বৈধ নির্দেশের আনুগত্য করবে। বিবাহের পর স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পুরুষ নারীর কর্তা। এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং এজন্য যে, পুরুষ (স্ত্রীর জন্যে) নিজের ধন সম্পদ খরচ করে। কাজেই স্বতী সাধ্বী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে।[২৪] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'নারীদের যেমন (পুরুষের উপর) ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে তদ্রূপ পুরুষেরও (নারীদের উপর) অধিকার আছে। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের (বিশেষ) অধিকার রয়েছে।[২৫] কিন্তু স্বামীর অন্যায় ও নাজায়েয আনুগত্য লাভের কোন অধিকার নেই। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আল্লাহর নাফরমানি করে কারো আনুগত্য করা যাবে না।[২৬]

খ. স্ত্রী তার সত্তাকে সম্পূর্ণ স্বামীর কাছে সমর্পণ কবে। বিবাহের পর স্বামী যখন স্ত্রীকে তার দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য আহ্বান করবে, তখন অসুস্থতা ও শরয়ী কোন বাধা না থাকলে স্বামীর আহ্বানে স্ত্রীর সাড়া দেয়া কর্তব্য।

গ. স্বামী তার বাড়িতে যাদের প্রবেশ পসন্দ করে না, তাদেরকে স্ত্রী প্রশ্রয় দেবে না। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন, স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকারের একটি হলো, তোমরা যাদের পসন্দ করো না, তাদেরকে তারা তোমাদের শয়নকক্ষে যেতে দেবে না। এবং তোমরা যাদের পসন্দ করো না, তারা তাদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না।[২৭]

ঘ. বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত, স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী পারিবারিক আবাসের বাইরে যাবে না। তবে শর্ত হলো, সেই আবাসস্থলটিতে জীবন ধারণ ও জরুরি প্রয়োজনীয় উপকরণ বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তবে বাইরে যেতে কোন বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস, 'এক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? রসূলুল্লাহ স. বলেন, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হলো, বিনা অনমুতিতে সে স্বামীর ঘরের বাইরে যাবে না। যদি স্ত্রী এমনটি করে তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত আসমানের ফেরেশতা রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।[২৮]

তবে স্ত্রীর যদি চাকুরী বা ব্যবসা থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী সমঝোতার মাধ্যমে বাইরে যেতে পারবে।

ঙ. স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে সফর করতে পারবে : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারের একটি হলো স্বামীর ইচ্ছা মতো স্ত্রীকে নিয়ে সফর করতে পারবে।

চ. স্ত্রী স্বামীর সেবা করবে : স্ত্রীর জন্যে স্বামীর খেদমত প্রশ্নে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। তবে সর্বসম্মত অভিমত হলো, স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয় বটে

কিন্তু সাধারণত স্ত্রীলোকেরা যা করে থাকে স্ত্রীর ততটুকু করা উত্তম এবং তা সামাজিক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, নৈতিক দৃষ্টিতে স্বামীর সেবা করা স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়।

মালেকী ফকীহ্গণ বলেন, সে অঞ্চলের অধিকাংশ মহিলারা যতটুকু স্বামীর সেবা করে ততটুকু করা ওয়াজিব।[২৯]

ছ. স্বামী স্ত্রীকে শিষ্টাচার সম্পর্কীয় শিক্ষা-দীক্ষা করতে পারবে। সকল ফকীহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, ধর্মীয় ও সাংসারিক যে কোন বিষয়ে স্বামী স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারে।

তিন. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

ক. বিবাহ সম্পাদনের পর স্বামীর উপর স্ত্রীর মহর প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর পরিশোধ করা ফরয। এ বিধান কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশ, 'আর সানন্দ চিত্তে স্ত্রীর মহর আদায় করে দাও।[৩১] রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, 'একটি লোহার আংটি দিয়ে হলেও মহর দাও।'[৩২] মহরের কোন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নেই। তবে উভয়ের জন্যে মানানসই ও স্ত্রীর জন্যে অমর্যাদাকর না হয় এবং স্বামীর জন্যে যাতে পরিশোধ করা কষ্টকর না হয় মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। পরিশোধ না করে মোটা অংকের মহর ধার্য করা গোনাহের কাজ। এটা অনাদায়ী ঋণ হিসাবে গণ্য।

খ. খোরপোষ ও বাসস্থান : বিবাহের পর স্ত্রীর থাকা, খাওয়া, পোশাক ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্বামীকে সাধ্যমত স্ত্রীর মর্যাদা ও সামাজিকতা রক্ষা করে এসব ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন, আর সন্তানের পিতার (তথা স্বামীর) দায়িত্ব হলো, রীতি অনুযায়ী স্ত্রীর জীবিকা ও পরিধেয় এর ব্যবস্থা করা।[৩৩]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর নামে শান্তির জন্য তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালেমা পড়ে তোমরা তাদের দেহ হালাল করেছো। তারা তোমাদের কাছে রীতি অনুযায়ী জীবন ধারণের খরচপাতি পাবার হকদার।[৩৪]

গ. স্ত্রী স্বামীর সেবা পাবার হকদার : খাওয়া, পরা, বাসস্থান ছাড়া স্ত্রী স্বামীর কাছে তার জীবনধারণ, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপনের যাবতীয় বৈষয়িক, মানবিক সেবা পাওয়ার অধিকারী হবে।

ঘ. স্ত্রীকে পবিত্র রাখা : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারের আর একটি হলো, তাকে চারিত্রিক স্খলন থেকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করা। তাকে চাহিদা মতো সঙ্গ দেয়া, অবৈধ কাজে লিপ্ত না করা। যাতে হালাল উপভোগের মাধ্যমে সে হারাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান

কয়েকটি কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটে। তন্মধ্যে মৃত্যু, তালাক, খুলা, ঈলা, লি'আন, যিহার, স্বামী-স্ত্রীর কারো ধর্মত্যাগ, স্বামীর দীর্ঘ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অথবা এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হওয়া যা বৈবাহিক সম্পর্ককে রহিত করে দেয়।

প্রসঙ্গ: তালাক

তালাকের আভিধানিক অর্থ : তালাক আরবী শব্দ। অর্থ: ছেড়ে দেয়া, ভিন্ন করা, বিচ্ছিন্ন করা, অবমুক্ত হওয়া ও বন্ধন অপসৃত হওয়া।[৩৬]

তালাকের পারিভাষিক অর্থ : নির্ধারিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে স্বামী কর্তৃক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা।

বৈশিষ্ট্য : তালাক হলো নিরুপায়ের উপায় হিসাবে নিকৃষ্টতম ও ঘৃণ্যতম বৈধ কাজ। এর চেয়ে ঘৃণ্যতম কোন কাজ ইসলামে বৈধ নয়। মহানবী স. বলেন, 'আবগাদুল হালালি ইলাল্লাহি আত্ তালাক' (আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ কাজ হলো তালাক)।

প্রয়োজনীয়তা

জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করা এবং মানুষের বংশধারা নিষ্কলুষ রাখার লক্ষ্যেই নর ও নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই মহান আল্লাহ নর ও নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও আবেগ সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং আবেগকে সুন্দর ও পরিশীলিত রীতিতে প্রকাশের জন্য শরীয়ত একটি বাস্তবসম্মত দাম্পত্য জীবন পদ্ধতির নমুনা পেশ করেছে।[৩৭]

কিন্তু সুখ ও শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনও নানা কারণে দুর্বিসহ হয়ে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং তা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যখন পারস্পরিক সম্পর্ক অসহ্যকর হয়ে ওঠে এবং বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বিপন্ন হয়। এমতাবস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যথায় দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষতির চেয়ে আরো মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়। অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে চলে যায়, তখন ইসলামী আইনের 'বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্যে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি মেনে নেয়া' এই মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামী শরীয়ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে বিধান রেখেছে তাকেই বলা হয় তালাক।[৩৮]

তালাকের তাৎপর্য

ইসলামের নীতি ও আদর্শ হচ্ছে, একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সবার মধ্যে মায়া-মমতা স্নেহ শ্রদ্ধার সমন্বয়ে কলহমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা। অভিযোগ করা হয়, তালাকের ব্যবস্থা রেখে ইসলাম নারীদের উপর জুলুম করেছে। কথাটি বাস্তবসম্মত নয়, তালাকের দ্বারা শুধু নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং স্বামীই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাদের সন্তানাদি এবং পরিবারের লোকজন। বস্তুত ইসলাম প্রয়োজনের তাকীদে তালাককে বৈধতা দিয়েছে কিন্তু তালাকের প্রতি উৎসাহিত করেনি। বরং যাতে তালাকের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয় এজন্য ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে।[৩৯]

তালাকের অনুমোদন

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন, 'আর যদি তারা তালাক দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'[৪০] এই তালাক দুইবার, এরপর হয় স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে রাখবে নয়তো সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।

'হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার ইচ্ছা করো, ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের তালাক দিও। এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং আল্লাহকে ভয় করো...। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করে। তুমি জানো, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন।'

রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ যেসব জিনিস বৈধ করেছেন তন্মধ্যে তালাক সবচেয়ে অপসন্দনীয় ও নিকৃষ্ট হচ্ছে তালাক।[৪১]

তালাক প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বড় ক্ষতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষতি মেনে নেয়ার নীতি হিসাবে ইসলাম দাম্পত্য বিরোধের শেষ সমাধান হিসেবে তালাক অনুমোদন করেছে। কিন্তু এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যাতে কোন মুসলিম পরিবারে সৃষ্টি না হয় এজন্য ইসলাম দম্পতিকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, এগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুসরণ করলে তালাকের মতো ঘটনা কমই ঘটতো।

ইসলামের বিবাহ-পূর্ব নির্দেশনা

১. ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আল্লাহ তাআলা সমাজ ও পরিবারের অভিভাবক এবং কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই তাদের বিবাহ দিতে।

২. রসূলুল্লাহ স. যাদের বিবাহ করার দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য আছে তাদরেকে বিবাহ করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। আর যাদের সামর্থ্য নেই, তাদেরকে বলেছেন রোযা রাখতে।

৩. রসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন, তোমাদের কাছে যখন এমন কোন বিবাহের পয়গাম আসে, যার দীন ও চারিত্রিক অবস্থা তোমাদের মুগ্ধ করে তার সাথে বিবাহ কর্ম সম্পাদন করো। যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে যমীনে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে।[৪৩]

৪. রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, তোমরা শুধু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করো না, হতে পারে সৌন্দর্য তাকে (অংহকারী ও আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে) ধ্বংস করে দেবে। এবং ধন সম্পদ দেখেও বিবাহ করো না, সম্পদের প্রাচুর্যতা তাকে গোনাহ ও অপরাধে লিপ্ত করতে পারে। বরং দীনদারী দেখে তাদের বিবাহ করো। দীনদার একটি কালো নাক বোচা বাদীও (আত্মম্ভরী ও অপরাধপ্রবণ বিত্তশালীনী) থেকে উত্তম।[৪৪]

৫. সাহাবী হযরত মুগীরাকে কোন এক নারীর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব করা হলে রসূলুল্লাহ স. মুগীরা রা.-কে বললেন, 'তুমি তাকে দেখে নাও। এটি সম্প্রীতি ও স্থায়ীত্বের জন্য বেশি সহায়ক।'[৪৫]

বিবাহ পরবর্তী নির্দেশনা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো মতপার্থক্য, বিরোধ, পসন্দ-অপসন্দের ভিন্নতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে যাতে দাম্পত্য জীবনে বিরোধ সৃষ্টি না হয়, এজন্য আল্লাহ তাআলা ও আল্লাহর রসূল স. স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিপূর্ণ, ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

ক. তাদের সাথে সদাচার করবে। তোমরা যদি তাদের (কোন কর্ম, কথা কিংবা আচরণে) অপসন্দ কর, তবে হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাই অপসন্দ করছো।[৪৬]

খ. রসূলুল্লাহ স. বলেন, কোন ঈমানদার পুরুষ (স্বামী) ঈমানদার নারীকে (স্ত্রী) বিচ্ছিন্ন করবে না। তার কোন কাজ বিরক্তিকর হলেও অন্য কাজ সন্তুষ্টিজনক হতে পারে।[৪৭]

স্ত্রীর কোন বিষয় যদি এমন হয় যে, স্বামীর পক্ষে তা উপেক্ষা করা অসম্ভব এবং সহ্য করাও কঠিন তখনো স্বামীকে তালাক না দিয়ে মহান আল্লাহ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো (অথবা দুরাচার দুর্ব্যবহার সহ্য করো) তবে তাকে সদুপদেশ দাও (অর্থাৎ বোঝাও, তাতে কাজ না হলে) তাদের শয্যা বর্জন করো (তাতেও কাজ না হলে) তাদের শাসন করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে (প্রতিশোধমূলক বা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য) কোন পথ অন্বেষণ করো না।[৪৮]

স্বামীর প্রতি নির্দেশ

স্ত্রীর যে কোন ত্রুটি ও অপরাধে স্বামীর প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো :

১. শুরুতেই তাকে উত্তমভাবে বুঝাতে চেষ্টা করবে।

২. তাতে কাজ না হলে, সাময়িক ভাবে তার শয্যা ও সহবাস ত্যাগ করবে।

৩. তাতেও কাজ না হলে চেহারা ছাড়া যাতে শরীরে কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয় এভাবে হালকা কোন কিছু দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করবে। এর অর্থ হলো অন্যায়ের বিপরীতে কঠোরতা প্রদর্শন করা মাত্র।[৪৯]

স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন, কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা পরস্পর নিস্পত্তি করতে চাইলে, তাদের কোন গোনাহ নেই, বরং আপস নিস্পত্তিই উত্তম।[৫০]
রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে স্ত্রী (উপযুক্ত কারণ ছাড়া) স্বামীর কাছে তালাক দাবি করে, সে তার জন্যে জান্নাতের ঘ্রাণও হারাম করে ফেলে।[৫১]

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. স্ত্রীদেরকে ছাড় দিতে বলেছেন। পক্ষান্তরে স্বামীদের যা বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, নারীদেরকে বানানা হয়েছে পাঁজড়ের হাড় থেকে, পাঁজরের হাড় বাঁকা থাকে। নারীদের স্বভাবের মধ্যেই কিছুটা বক্রতা রয়েছে। এটাকে বাঁকা রেখেই কাজ নিতে হবে। সোজা করতে চাইলে ভেঙে যাবে। বরাত?

এরপরও যদি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ নিজেদের মধ্যে মেটানো সম্ভব না হয় তখন আল্লাহ তাআলা পারিবারিক সালিশের মাধ্যমে তা নিরসনের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি তাদের (স্বামী স্ত্রীর) মধ্যে বিরোধের আশংকা করো, তাহলে তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন এবং (তার) স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে সালিশ মনোনীত করবে। তারা উভয়েই নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবিশেষ অবহিত এবং সর্বজ্ঞ।'[৫২]

উপরে উল্লেখিত সকল চেষ্টাই যদি নিষ্ফল হয়ে যায় তবে এর অর্থ হলো, বিবদমান স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আর কোনই অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে এসেই কেবল তালাক প্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

তালাকের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার আগে তালাকের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা জরুরি।

তালাকের প্রকার

ফলাফল ও সময়ের বিচারে তালাক দুই প্রকার : ১. রাজঈ তালাক, ২. বায়েন তালাক।

বায়েন তালাক দুই প্রকার : ক. বায়েন ছুগরা, খ. বায়েন কুবরা।

গুণাগুণ বিচারে তালাক দুই প্রকার : ১.সুন্নী তালাক, ২. বিদঈ তালাক।[৫৩]

১. রাজঈ বলা হয় এমন তালাককে, যে তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনর্বার বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে আনতে পারে।

২. বায়েন বলা হয় যে তালাক তাৎক্ষণিক ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।
বায়েন তালাক দুই প্রকার : বায়েন ছুগরা, বায়েনে কুবরা।

ফলাফল

রাজঈ : কেউ যদি স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দেয়, তবে সে পুনর্বিবাহ ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। স্বামী স্ত্রীর সাথে ফিরিয়ে আনার অর্থবোধক শব্দ বলে, কিংবা স্ত্রীর সাথে স্বামী সুলভ আচরণ, চুমু, সহবাস কিংবা কামভাবের সাথে স্পর্শ বা আলিঙ্গন দ্বারাই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

বায়েন ছুগরা : তালাক শব্দের সাথে বাঈন শব্দ যোগ করে এক বা দুই তালাক দিলে বাঈন তালাক হয়ে যায়। এরূপ তালাক উচ্চারণের সাথে সাথে স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হলে পুনর্বার বিবাহ পড়াতে হবে। যে বাঈন তালাকের পর পুনর্বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায় বলে তাকে বলে বাঈন ছুগরা।

বায়েন কুবরা : যদি স্বামী স্ত্রীকে এক সাথে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক দিয়ে দেয় তবে তাকে বাঈন কুবরা তালাক বলা হয়। এই তালাকের পর স্বামীর পক্ষে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যদি না স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে অন্য কারোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের পর বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হয়।

সুন্নী তালাক : যে তালাকে তালাকদাতা শরীয়তের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে সুন্নী তালাক বলে।

বিদঈ তালাক : যে তালাক প্রয়োগে তালাকদাতা শরীয়তের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে না তাকে বিদঈ তালাক বলে।

সুন্নী তালাক দুই প্রকার : ১. আহসান তালাক, ২. হাসান তালাক।

আহসান তালাক : আহসান তালাক হলো এমন তালাক যে তালাক দেয়ার সময় স্ত্রী ঋতুস্রাব ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকে, অথবা স্ত্রী গর্ভবতী থাকে না এবং ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর সাথে কোন সহবাস করেনি। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক রাজঈ দিলে সেটি হবে আহসান তালাক। আহসান অর্থ অতি উত্তম। এটিকে তালাকের অতি উত্তম পদ্ধতি এজন্য বলা হয়, কোন বৈবাহিক সম্পর্ক যদি ছিন্ন করার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়ে, তাহলে যাতে স্ত্রীর জন্যে দীর্ঘ সময় ইদ্দত পালনের কষ্ট করতে না হয় এজন্য ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর এক তালাক রিজঈ প্রয়োগ করে রাজায়াত না করলে তিন ঋতুকাল ইদ্দত যাপনের পর তালাক কার্যকরী হয়ে যায়। আর বাড়তি কোন তালাক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু এখানে বিচ্ছিন্নতাই মূল উদ্দেশ্য তা যতো সহজ ভাবে অর্জন করা যায় তাই কাম্য। সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োজনে এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন।

হাসান তালাক : স্ত্রী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে এক তালাক দেয়া এবং একইভাবে পরপর আরো দুই ঋতু পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় সহবাস বা রাজায়াত না করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক প্রয়োগ করা।

বিদঈ তালাক : বিদঈ তালাক হলো, এক সঙ্গে একাধিক বা একই মসলিসে এক এক করে তিন তালাক বলা। কিংবা স্ত্রীর ঋতুকাল থাকা অবস্থায় কিংবা স্ত্রীর নিফাস থাকা অবস্থায় কিংবা ঋতু পরবর্তী কালে সহবাস করার পর তালাক প্রয়োগ করা। এতেও তালাকের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় বটে কিন্তু তা স্ত্রীর জন্য যেমন অসম্মানজনক তদ্রুপ সহবাসের কারণে কিংবা স্ত্রীর ঋতুকাল অথবা গর্ভবতী হওয়ার কারণে ইদ্দতকাল দীর্ঘ হয়ে যায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং স্ত্রীর জন্য কষ্টকর। রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কেরাম তালাকের এ প্রক্রিয়াকে নিন্দা করেছেন এবং অপরাধ হিসেবে গণ্য করতেন। হযরত উমর রা. তালাকের এই প্রক্রিয়া অবলম্বনকারীদের শাস্তি দিতেন। কেননা, এটি কুরআন কারীমের ঘোষণার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, 'তালাক দুইবার : অতপর হয় সদ্ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীকে রাখ নয়তো সুন্দর ও ভদ্রোচিত ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও।'[৫৪]

তালাকের পদ্ধতি

তালাকের সহজ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে অনেকে একবাক্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। অতপর পরিস্থিতির ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়ে মিথ্যাচার, ছলচাতুরী ও বাহানার আশ্রয় নেয়। তালাক ঘৃণ্যতম বৈধ কাজ হলেও সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে ইসলামী আইনে। অজ্ঞতাবশত লোকেরা মনে করে তিন তালাক না দেয়া পর্যন্ত দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হয় না। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়।

১. এক তালাক ও তার আইনগত ফলাফল

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যদি তালাক দিতেই চায় তবে তাকে এক তালাকই প্রদান করা উচিত, তা যে কোন প্রকারের তালাকই হোক। এই অবস্থায় স্ত্রীর তিনটি মাসিক ঋতুকাল অতিবাহিত হলে তার ফল দাঁড়ায় (ক) সে ইচ্ছা করলে ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করতে পারে অথবা (খ) যদি সে তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তাহলে সে পথও তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এই ক্ষেত্রে নিয়মও খুব সহজ। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ইজাব কবুল করে নিবে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বলবে, আমি নিজেকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম। অপরজন বলবে, আমি কবুল করলাম। এতেই তাদের দাম্পত্য বন্ধন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে আলেম-ওলামা, কোর্ট-কাচারী সাক্ষী-সাবুদ কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

২. *দুই তালাক ও তার আইনগত ফলাফল*

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে একত্রে বা ভিন্নভাবে দুই তালাক দেয়, তা যে কোন প্রকারের তালাকই হোক, তবে স্ত্রীর তিনটি মাসিক ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তার ফল দাঁড়ায়– ঠিক এক তালাকের অনুরূপ। এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত রূপে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় সহজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। একথাটিই আল্লাহতাআলা বলেছেন, 'আত-তালাকু মাররাতান' (তালাক দুইবার)। 'ফাইমসাকুম বিল মারুফ আওতাসরীহুম বিইহসান' (অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয় বা ন্যায়সংগতভাবে মুক্ত করে দেবে)।[৫৫]

৩. *তিন তালাক ও তার আইনগত ফলাফল*

অর্থাৎ দুবার তালাক দেয়ার পর গভীরভাবে চিন্তা করো, তুমি যদি তৃতীয় তালাক দাও তবে পরিস্থিতি তোমার জন্য ভয়াবহ রূপ নেবে।

আল্লাহর বাণী : 'অতপর সে (স্বামী) যদি তাকে (স্ত্রীকে তৃতীয়) তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) তার (স্বামীর) জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত না সে (স্ত্রী) তাকে ব্যতীত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় আর (ইদ্দত পালনের পর) তারা (পূর্ব স্বামী-স্ত্রী) যদি মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্বিবাহে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর বিধান, প্রজ্ঞাবান সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন' (সূরা আল বাকারা ২৩০)।

আয়াতে আরো একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা হলো, তোমরা পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হলে আবার পূর্বেকার ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না– এরূপ নিশ্চিত হলেই কেবল তোমরা পুনর্বার একত্র হও, অন্যথায় নয়। বারবার আল্লাহ নির্ধারিত বিধিনিষেধ লংঘন করা যাবে না।

এক বা দুই তালাকের ক্ষেত্রে তুমি স্ত্রীকে যতো সহজ পদ্ধতিতে তোমার বিবাহ বন্ধনে পুনর্বার ফিরিয়ে নিতে পেরেছো, তিন তালাক বা তৃতীয় তালাক দিলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করবে। এ অবস্থায় (ক) স্ত্রীকে ভদ্রভাবে বিদায় দিতে হবে, কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে তা হবে পাপ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। (খ) মোহরানা বাবদ স্ত্রীর সমস্ত প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, কোনরূপ গড়িমসি করা যাবে না। (গ) স্ত্রীকে যেসব অলংকারপত্র টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি ও উপহারাদি দান করা হয়েছে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফেরত নেয়া যাবে না বা ফেরত দেয়ার দাবিও করা যাবে না। 'তোমরা যদি স্ত্রীকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?[৫৬]

(ঘ) তিন বা তৃতীয় তালাক দেয়ার সাথে সাথে তিন মাসের জন্য স্ত্রীকে আলাদা বাসস্থান দিতে হবে এবং তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

তাহলীল (বৈধকরণ)

(ঙ) স্ত্রীকে পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে ফেরত নিতে চাইলে তা আর এক বা দুই তালাকের মত সহজে নেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে দস্তুর মত স্ত্রীকে ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করতে হবে। অতপর এই দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় তবে তিনটি মাসিক ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে পুনরায় সাক্ষী-সাবুদ রেখে দেনমোহর ধার্য করে বিবাহ বন্ধনে ফেরত নেয়া যাবে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় একেই বলে তাহলীল (বৈধকরণ বা হালালকরণ)।

তালাকের অপব্যবহার

ইসলামী সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার মধ্যে এখানেই পার্থক্য। পাশ্চাত্য সমাজের মত এখানে ইচ্ছা করলেই যথেচ্ছভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরুষের পর পুরুষ বা নারীর পর নারী বদল করার সুযোগ নেই। কারণ দাম্পত্য জীবনই হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই পাশ্চাত্য সমাজেরও সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলো ইসলামের পরিবার ব্যবস্থা মেনে চলার চেষ্টা করে। ইসলামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের কোন সুযোগ নেই। এখানে একটি আইন কাঠামোর মধ্যেই দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে হয়।

মুসলিম সমাজে তাই পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় পরিবার (দাম্পত্য সম্পর্ক) ভেঙ্গে যাওয়ার হার খুবই কম। পরিসংখ্যানগত উপাত্ত সংগ্রহ করলে এর হার শতকরা দুই ভাগও হবে কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে এই হার সর্বোচ্চ। আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড. আইওনী ব্রিসটো জানিয়েছেন, 'আমেরিকায় প্রতি বছর ৬৫% ভাগ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সন্তানসহ তাড়িয়ে দেয়, ৭০% ভাগ স্বামী-স্ত্রীকে প্রহার করে এবং গড়ে সাত লাখ নারী ধর্ষিতা হয়।[৫৭]

হিলা শব্দটি মূলত কৌশল ও অপকৌশল উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ার পূর্বদিন সে তার যাকাতযোগ্য সম্পত্তি তার পুত্র কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলো। ফলে তার উপর যাকাত ফরয হলো না। এটি যাকাত এড়ানোর একটি অপকৌশল। শব্দটি অপপ্রয়োগে হিল্লা রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'হিল্লা' বিবাহ একটি অজ্ঞতাপ্রসূত বিবাহ পদ্ধতি, তা এ সমাজে কিভাবে প্রচলিত হয়েছে সেটি অবশ্য গবেষণার বিষয়। স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে সম্বিত ফিরে আসার পর স্বামী গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়া থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় তার অপকৌশল অন্বেষণে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে তার পছন্দমত একজন লোককে কিছু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে এক রাতের জন্য তার নিকট নিজ স্ত্রীকে বিবাহ দেয়। অতপর ভোর বেলা সে তাকে তালাক দেয় এবং সন্ধ্যাবেলা প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ

করে। রসূলুল্লাহ স. এই ভাড়াটে স্বামীদের ভাড়ায় খাটা ষাঁড় বলেছেন এবং এদের অভিসম্পাত করেছেন।[৫৮]

তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের নীতি

বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি ও পবিত্র সম্পর্ক। কোন ঠুনকো কারণে এই সম্পর্ক ছিন্ন হলে স্বামী স্ত্রী ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। অনেক সময় বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইসলামী শরীয়ত তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতগুলো নীতি আরোপ করেছে। তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো পালন করা কর্তব্য।

এক. তালাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুমোদন থাকতে হবে। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে তালাক প্রয়োগে শরীয়ত সম্মতি দিয়েছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে হবে।

দুই. তালাক এমন অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে যখন স্ত্রী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র এবং এই পবিত্রাবস্থায় স্বামী স্ত্রী সহবাস করেনি।

তিন. এক মাসে এক তালাকের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

ফকীহদের দৃষ্টিতে ঋতুকালীন কিংবা সহবাস পরবর্তী তালাক গোনাহের কাজ।

কারণ, ঋতুকালীন অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দতের সময় বৃদ্ধি পায়, যা স্ত্রীর কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। সহবাস পরবর্তী তালাকের পর গর্ভবতী হয়ে ইদ্দত বৃদ্ধির আশংকা থাকে। সেই সাথে কামভাব চরিতার্থ করার ফলে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের প্রাবল্যে ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা বৈরিতাকে বৃদ্ধি করে। এই অবস্থাটা তালাকের জন্য সহায়ক হতে পারে, বস্তুত এই অবস্থাগুলো আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থি।[৫৯]

চার. পৃথক পৃথক ভাবে এক মাসে এক তালাকের বেশি প্রয়োগ না করা। এক শব্দে তিন তালাক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই মজলিশ বা মাসে তিন তালাক প্রয়োগ না করা। কেননা, তালাকের বৈধতার কারণ হলো, মারাত্মক ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে স্বামী স্ত্রীকে মুক্ত রাখা। এটি এক তালাকের দ্বারাই অর্জিত হয়। এক তালাকের পর উভয়ে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা ও পরবর্তীতে সৃষ্ট দুর্ভোগের বিবেচনা করে রাজাআত করার সুযোগ থাকে। এই অবকাশ তিরোহিত করাটা শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। এটি মহান আল্লাহর নির্দেশেরও পরিপন্থী।

উপরে বর্ণিত নীতি পালন না করে ঋতুকালীন সময়ে, সহবাসের পরে, কিংবা এক সাথে একাধিক তালাক প্রয়োগ করলে ফকীহগণের মতে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রয়োগকারী গোনাহগার ও শাস্তি যোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।[৬০]

প্রসঙ্গ হিল্লা বিবাহ

সংগা : হিল্লা বিবাহ ইসলামী আইনে 'নিকাহ আততাহলীল' এর বিকৃতরূপ। তাহলীল আরবী শব্দ হিল্লুন শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছু খোলা অথবা গিরা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করা। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা আ. এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানী' 'আমার যবান থেকে স্বচ্ছন্দে কথা না বলতে পারার প্রতিবন্ধকতা দূর করে দাও।'[৬১] হিল্লুন শব্দ কোন জায়গায় বসবাস ও অবস্থান করা, অবতরণ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'আনতা হিল্লুন বিহাযাল বালাদ 'আর তুমি এই নগরের অধিবাসী।[৬২] হারাম এর বিপরীত হালাল অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, কুল্লু তাআমিন কানা হিল্লান লিবানী ইসরাঈলা' নিজেদের আরোপিত হারাম করা ছাড়া সব খাবারই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল।'[৬৩]

ইসলামী আইনে 'নিকাহ আততাহলীল' হলো কোন স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সেই স্বামীর জন্যে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার জন্যে অন্য কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং এই স্বামীর সাথে এই মহিলার বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান হওয়া।[৬৪]

বাংলাদেশে হিল্লা বিবাহ : এদেশের সমাজে প্রায় ক্ষেত্রেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে কিংবা আবেগ তাড়িত হয়ে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। তালাক দেয়ার ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করে না। তালাকের পর পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে যাচ্ছেতাই করে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনস্থাপনের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকেরা কারো সাথে নামকাওয়াস্তে বিয়ের মাধ্যমে পুনর্বার সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে ঘরসংসার করার ব্যবস্থা করে। এই ব্যবস্থাটি সমাজে হিল্লা বিবাহ বলে পরিচিত।[৬৫]

অপরদিকে প্রায়ই সংবাদপত্রের পাতায় 'হিল্লা' বিবাহের ঘটনা : নারীর প্রতি অসম্মান ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞলোকদের ফতোয়া দানের প্রসঙ্গ আলোচনা সমালোচনার ঝড় তুলে। ২০০৭ সালের পয়লা জুলাই ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যায়যায়দিন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, 'বগুড়ায় হিল্লা বিয়ের গ্রাম' শিরোনামে চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হলে এ নিয়ে সমাজ ও প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। প্রতি দিনই দেশের আনাচে-কানাচে তালাকের ঘটনা ঘটছে এবং হিল্লা বিবাহের মাধ্যমে পুনর্বার সংসার জোড়া দিয়ে অনেক লোক গোনাহগারের জীবন যাপন করছে।

তালাক ও তাহলিল এর কুরআনিক যোগসূত্র

মহান আল্লাহ সূরা বাকারার শেষার্ধে ২২৭ নম্বর আয়াত থেকে ২৩৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আয়াতসমূহে বিবাহ, তালাক, তালাকের পদ্ধতি, খোরপোষ ও তাহলিল সম্পর্কে বিধি বিধান ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর শানে নুযুলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, জাহেলী যুগে লোকেরা বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে নারীদের চরম উৎপীড়ন ও অত্যাচার করতো। জাহেলী যুগে নারীরা সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রসূলুল্লাহ স. এর নবুয়তের পর বিবাহ তালাক উত্তরাধিকারসহ সবক্ষেত্রে নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়ে আল্লাহ তাআলা সমস্যাসংকুল নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।[৬৬]

তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুনর্বার স্বামীর জন্যে পাঁচটি শর্তের ভিত্তিতে হালাল হতে পারে–

১. তালাক প্রাপ্তির পর স্ত্রী ইদ্দত পুরো করলে।

২. অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে।

৩. দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সঙ্গম করলে।

৪. দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে।

৫. দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয়ার পর সে ইদ্দত পালন সমাপ্ত করলে।[৬৭]

অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ হওয়ার তাৎপর্য হলো, তালাকদাতা স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আগ্রহী হয়ে সেই মহিলাকে বিবাহ করবে এবং স্থায়ী ভাবে তাকে নিয়ে ঘর সংসার করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে। এবং এই স্ত্রীর সাথে উক্ত স্বামীর মিলন হবে।[৬৮]

কারণ অস্থায়ী সাময়িক বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রচলিত হিল্লা বিবাহের মধ্যে শুধু প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল করার উদ্দেশ্য থাকে বিধায় এই বিবাহ বৈধ নয়। কারণ শরীয়তে বিবাহের উদ্দেশ্য হলো স্থায়ীভাবে ঘরসংসার করে যৌন তৃপ্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে আবাদ রাখা। বলার অপেক্ষা রাখে না, মিলন ছাড়া যৌনতা পূর্ণতা লাভ করে না।[৬৯]

পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার জন্যে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত হিল্লা বিয়ে অবৈধ এ ব্যাপারে সর্বসম্মত মত ব্যক্ত করেছেন সকল ইমাম, ফকীহ এবং উলামা। দলীল হিসেবে তারা বহু হাদীস বর্ণানা করেছেন। তন্মধ্যে ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, উকবা ইবনে আমের বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি কি তোমাদেরকে ধার করা ষাড় সম্পর্কে বলবো? সাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ বলুন। ধার করা ষাড় হলো, যে হালাল করার জন্যে বিবাহ করে।[৭০] রসূল স. আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা হিলাকারী ও হিলাকারিণী উভয়কেই লানত দিয়েছেন।[৭১] আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন, হযরত উমর রা. বলেছেন, আমার কাছে হিলাকারী ও হিলাকারীনীকে যেন কেউ নিয়ে না আসে। কারণ আমি তাদের উভয়কেই রজম করবো।[৭২]

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এবিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী ইসলামের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করলে দাম্পত্য জীবনের সবধরণের বিরোধ, বিবাদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। তারপরও যদি তালাকের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতেও ইসলামী বিধান অনুসরণ

করলে সমাজ জীবনে এর বিরূপতা লাঘব করা যায়। আমাদের সমাজে তালাক ও হিল্লা বিয়ের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাব মূলত ইসলামের অনুশাসনগুলো সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও অনুশীলনহীনতা। উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া দরকার।

১. বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী ইসলামের বিধান ও নির্দেশনাগুলো পালনের ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরী করতে হবে।
২. সর্বস্তরের শিক্ষা কারিকুলামে এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. গণমাধ্যম তথা প্রিন্টও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় উল্লেখিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।
৪. ইসলামী বিধানাবলী লংঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।
৫. শরীয়া পরিপালন মনিটরিং-এর জন্য একটি সরকারী-সংস্থা গঠন করতে হবে। সর্বোপরি ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. মিসবাহুল মুনীর, লিসানুল আরব, কামুসুল মুহীত, মুজামুল ওয়াসীত।
২. রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, ইবনে আবেদীন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২, প্রকাশক দারুল কিতাব, দেওবন্দ, তা, বি।
৩. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১।
৪. আল কুরআন, সূরা রুম, আয়াত ২১।
৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, নিকাহ অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৬, হাদীস নং ১৮৪৬, ১ম সংস্করণ ২০০৫, দারু ইবনে হাইছাম, কায়রো, মিশর।
৬. মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৪।
৭. আল কুরআন, সূরা নূর, আয়াত ৩২।
৮. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭১।
৯. সূরা নিসা আয়াত ৩।
১০. সূরা নূর, আয়াত ৩২।
১১. ফাতহুল বারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১১২, প্রকাশক, মাকতাবাতুস সালাফিয়া।
১২. মুগনী আল মুহতায, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৪।
১৩. ফাতহুল কাদির, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯, আল-মবসূত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩, প্রকাশক, দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

১৪. আলমাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ৪১, পৃষ্ঠা ২১১-২১২ ওয়াযারাতুল আওকাফ, কুয়েত, ২য় সংস্করণ। প্রকাশকাল ২০০৫ইং।

১৫. ইবনু মাজাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯২, প্রাগুক্ত।

১৬. ফাতহুল বারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১০৪, প্রকাশক, মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ।

১৭. আলমাওসূয়াতুল ফিকাহিয়্যাহ, খণ্ড ৪১, পৃষ্ঠা ২১৬, প্রাগুক্ত।

১৮. সূরা নিসা, আয়াত ১৯।

১৯. সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮।

২০. সূরা নিসা, আয়াত ৩৬।

২১. তাফসীরে কুরতবী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৮। কাশশাফুল কিনা খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৩।

২২. সূরা নিসা, আয়াত ১২।

২৩. ফাতহুল বারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯২ প্রাগুক্ত।

২৪. আল কুরআন সূরা নিসা, আয়াত ৩৪।

২৫. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮।

২৬. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭১, প্রকাশক দারুল মাআরিফ, কায়রো।

২৭. তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৮, দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর, ২০০৫।

২৮. মুসনাদে বায়যার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৭, প্রকাশক, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

২৯.আলমাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ৪১, পৃষ্ঠা ৩১৬ প্রাগুক্ত।

৩০. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৩৪।

৩১. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৪।

৩২. ফাতহুল বারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৫ প্রাগুক্ত।

৩৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩।

৩৪. সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৮, প্রকাশক, ইসা আল হালবী, বৈরুত।

৩৬. দুররুল মুখতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬।

৩৭. দুররুল মুখতার খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭, শরহুল কবীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আলমুগনী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৬।

৩৮. আল মাওসুয়াতুল ফিকাহিয়্যাহ, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ১০, প্রকাশক ওয়াযারাতুল আউকাফ, কুয়েত, ২য় সংস্করণ ২০০৪ইং।

৩৯. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ড. ওয়াহাবা আযযুহাইলী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৮৭৪-৫। দারুল ফিকর, দামেশক, সিরিয়া, ৯ম সংস্করণ ২০০৬।

৪০. সূরা বাকারা, আয়াত ২২৭, ২২৯, সূরা তালাক, আয়াত ১।

৪১. আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩১।

৪২. আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭১২, মুসতাদরাকে হাকেম খণ্ড ২,পৃষ্ঠা ১৯৭।

৪৩. তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৮। দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৫ইং।

৪৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২১, হাদীস নং ১৮৫৯, প্রকাশক, দারুল হাইছাম, কায়রো মিশর ২০০৫।

৪৫. সুনানে তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা, ২৫৭, দারুল হাদীস, কায়রো ২০০৫।

৪৬. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ১৯।

৪৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫১৩ কিতাবুন্নিকাহ।

৪৮. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৩৪।

৪৯. হিদায়া, খণ্ড ২, কিতাবুত তালাক, যমযম বুকডিপো, দেওবন্দ।

৫০. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১২৮।

৫১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৮৭, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২০, দারুল হাদীস, কায়রো।

৫২. সূরা নিসা, আয়াত ৩৫।

৫৩. আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ২৬, প্রাগুক্ত।

৫৪. আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রফেসর ড. ওয়াবা আযযুহাইলী খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৯২৪।

৫৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২২৯ আয়াত।

৫৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত ২০।

৫৭. দৈনিক ইনকিলাব, ৫ জুন, ১৯৯৬ খৃ. (চারুকণ্ঠ)।

৫৮. আবু দাউদ, নিকাহ, বাব ১৫, তিরমিযী, ঐ, বাব ২৮; ইবনে মাজা, ঐ বাব ৩৩; দারিমী, ঐ, বাব ৫৩; নাসাঈ, তালাক, বাব ১৩, যীনাত, বাব ২৫।

৫৯. ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদল্লাতুহু, প্রফেসর ড. ওয়াহাবা আযযুহইলী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৯২৩।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯২৭।

৬১. মুজামু মুসতালিহাতি আলফাযিল ফিকহিয়্যাহ, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৫ এবং পৃষ্ঠা ৪৪৪/৪৫৫, প্রকাশক, দারুল ফযীলাহ কায়রো, মিশর।

৬২. সূরা বালাদ, আয়াত ২।

৬৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৩।

৬৪. কাতফুল আযহার ফি কাশফিল আসরার, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭৩, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার। ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, মুফতী আযীযুর রহমান উসমানী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৯০। উরুশ পাবঃ দেওবন্দ।

৬৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ ইং ই.ফা.বা.।

৬৬. আসবাবুন নুযুল, ইমাম সুয়ুতী, পৃষ্ঠা ৪৪, প্রকাশক দারুত তাকওয়া, প্রকাশকাল ২০০৪ খৃ.।

৬৭. তাফসীরুল কবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা, ৯৬, প্রকাশক, মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, প্রকাশকাল ২০০৩, কায়রো, মিশর। আলমুগনী ইবনে কুদামা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৪৬।

৬৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮০, (নাসিরুদ্দীন আলবানীর টীকা সম্বলিত) প্রকাশনায় মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর।

৬৯. ইজাহুল আদিল্লাহ, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুদল হাসান, পৃষ্ঠা ৫১১, প্রকাশক, শায়খুল হিন্দ একাডেমী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, প্রকাশকাল ১৯৯৩ইং।

৭০. ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৯৩৬। প্রাগুক্ত।

৭১. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ১০৭৭৭।

৭২. তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল্লামা আলুসী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২০৬, মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৪, পৃষ্ঠা : ১২৫-১৩৩

গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকের মজুরীর অধিকার ও ইসলামের বিধান

নাহিদ ফেরদৌসী

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশ্বেও সেই সুপ্রাচীন মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব এখনও বিরাজমান। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাঁটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে এবং পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস শিল্প শক্তিশালী ভূমিকা রেখে চলেছে। রপ্তানী আয়ের প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগ আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে।[১] কেবল রপ্তানী বাণিজ্যই নয়, এর সাথে সম্পৃক্ত আছে প্রায় অর্ধকোটি মানুষের কর্মসংস্থান। গার্মেন্টস শিল্প দেশের নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে আরও অনেকগুলো ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে।

১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে যাত্রা শুরু করা এ শিল্প সারা বিশ্বে পোশাক রপ্তানীতে অষ্টম স্থান অধিকারের মর্যাদা লাভ করেছে।[২] কিন্তু বর্তমানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। বেশীরভাগ শ্রমিকরা সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ মজুরী ও পারিশ্রমিক পায় না। মজুরী দীর্ঘদিন যাবত বকেয়া রাখা, খেয়াল খুশীমতো জরিমানা আদায় করা, বিভিন্ন অজুহাতে মজুরী কর্তন করে কম মজুরী দেয়া নিত্ত নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে ওঠেছে। মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা আইন সম্পর্কে শ্রমিকদের অসচেতনতা দিন দিন অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে ও তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রচলিত ৫০টি আইনের সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' পাস করা হয়। একই সাথে পূর্ববর্তী ২৭টি শ্রম আইন বাতিল করা হয়।[৩] এমনকি ২০০৬ সালে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ আইনও পাস করা হয়। শ্রমিকদের মজুরী সমস্যার সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধানের উপর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। দেশে শ্রম আইন আছে। মালিকদের সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন আছে এবং পর্যাপ্ত প্রতিকারের জন্য আদালত ব্যবস্থাও আছে। তথাপি শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত। কারণ এসব আইন পালন ও প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহলকে উৎসাহিত ও প্রেরণাদায়ক নৈতিক ও আদর্শিক কোন ভিত্তি এ আইনের মধ্যে নেই। ফলে এগুলো তেমন সুফল দিচ্ছে না। বস্তুত এসব সমস্যার সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সমাধান একমাত্র ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতি ও শ্রমনীতি চর্চা ও পালন করার মাধ্যমে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

শ্রমিকের মজুরী আইনের পটভূমি

মজুরী পরিশোধ বিষয়ক আইন শ্রমিকের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিধান।[৪] শিল্প শ্রমিকদের মজুরী আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মজুরী প্রদানে অনিয়ম দূর করতে তৎকালীন ভারত সরকার ১৯২৬ সনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯২৯ সনে গঠিত শ্রম বিষয়ক রয়্যাল কমিশন উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মজুরী প্রদানে অনিয়ম প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। অবশেষে তৎকালীন বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৬ সনের ২৩ শে এপ্রিল মজুরী পরিশোধ আইনটি পাস হয়। সে সময়ে তো অবশ্যই এবং একালেও এ আইনটিকে একটি পরিচ্ছন্ন আইন বলা যায়। এই আইন ১৯৪৭ সনে তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে কার্যকর থাকে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও প্রচলিত থাকে তবে ১৯৮০ সালে প্রথম আইনটিতে সংশোধনী আনা হয়। এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের প্রকৃত বন্টনযোগ্য মজুরী প্রদান এবং কোন রকম কর্তন ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের পূর্ণ মজুরী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ আইনের অধীনে মামলা বিচারের জন্য শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত করা হয় এবং হাইকোর্ট বিভাগের সমমানের শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করার বিধানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫]

মজুরী নির্ধারণ বোর্ড গঠনের পটভূমি

যদিও বৃটিশ ভারতে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করার জন্য বোর্ড গঠন করে ১৯৪৬ সনে ডঃ আম্বেদকর আইন সভায় একটি নিম্নতম মজুরীর বিল পেশ করা হয় কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ায় নিম্নতম মজুরী আইন আর পাস হয়নি। পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৭ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেন্টে 'নিম্নতম মজুরী আইন ১৯৫৭ পাস হয়। যদিও এটি ছিল একটি প্রাদেশিক আইন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে এই আইনটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া হয় এবং এটির পরিবর্তে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ পাস করা হয় । যেসব প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে মজুরী নিয়ন্ত্রনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এমন সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উল্লেখিত ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশটি বহাল রাখা হয়। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যৌথ চুক্তির মাধ্যমে মজুরী নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। যে ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষির কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে নূন্যতম মজুরী নির্ধারণের জন্য ১৯৬১ সালের ন্যূনতম মজুরী অধ্যাদেশের অধীনে ন্যূনতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়। তবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ঘোষণার এখতিয়ার এই বোর্ডের ছিল না।[৬] ১৯৮৮ সালে আইনটিতে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়। শ্রম আদালতকে এই অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত অপরাধ

বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। সংশোধিত আইনে যে কোন সংযুক্ত ব্যক্তি অধ্যাদেশের আওতাধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারতেন।[৭] অবশেষে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন পাস করা হয়। যদিও এই শ্রম আইনেও খুব একটা পরিবর্তন সাধন হয়নি। এই আইনের দশম অধ্যায়ের ১২০ ধারা থেকে ১৩৭ ধারা পর্যন্ত মজুরী ও তা পরিশোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং একাদশ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারা থেকে ১৪৯ ধারা পর্যন্ত মজুরী বোর্ড সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। বর্তমান ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের একাদশ অধ্যায়ে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের প্রায় সকল বিধানই স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত মজুরী আইন ও বাস্তবতা

২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী আদায়ের জন্য সহজ ও দ্রুত প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইনের ১২১ ধারাতে মজুরী পরিশোধের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ধারা ১২১

প্রত্যেক মালিক তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে, এই আইনের অধীন পরিশোধ করতে হবে এরূপ সকল মজুরী পরিশোধ করার জন্য দায়ী থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কোন শ্রমিকের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক অথবা তার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য কোন ব্যক্তিও উক্তরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন । আরো শর্ত থাকে যে, ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কোন শ্রমিকের মজুরী উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক পরিশোধ না করা হলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক উক্ত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করা হবে, যা ঠিকাদারের নিকট হতে সমন্বয় করা হবে। এছাড়াও ১২২ ধারাতে মজুরীকাল স্থিতিকরণ বিষয়ে বলা হয়েছে-

ধারা ১২২

(১) ১২১ এর অধীন মজুরী পরিশোধের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি উক্তরূপ মজুরী পরিশোধ সম্পর্কে মজুরীকাল স্থির করবেন।
(২) কোন মজুরীকাল এক মাসের উর্ধে হবে না।
মজুরী পরিশোধের সময় সম্পর্কে এই আইনের ১২৩ ধারায় বলা হয়েছে-

ধারা ১২৩

কোন শ্রমিকের যে মজুরীকাল সম্পর্কে তার মজুরী প্রদেয় হয় সেই কাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তার মজুরী পরিশোধ করতে হবে।
যে ক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের চাকুরী তার অবসর গ্রহণের কারণে অবসান হয়, অথবা মালিক কর্তৃক তার ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অপসারণ, বরখাস্ত অথবা অন্য কোন কারণে অবসান করা হয় সে ক্ষেত্রে

উক্ত শ্রমিককে প্রদেয় সকল মজুরী তার চাকুরী অবসানের তারিখ হতে পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

সকল মজুরী কর্মদিবসে পরিশোধ করতে হবে।

এছাড়াও মালিক যেন বিনা কারণে মজুরী কর্তন করতে না পারে সেজন্য ১২৫ ধারায় মজুরী হতে কর্তনযোগ্য বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান আছে। এই ধারার বিধানসমূহ নিম্নরূপ-

ধারা ১২৫

এই আইন দ্বারা অনুমোদিত কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের মজুরী হতে কিছুই কর্তন করা যাবে না।

কেবলমাত্র এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন শ্রমিকের মজুরী হতে কর্তন করা যাবে এবং উক্তরূপ কর্তন কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রকারের হবে, যথা :

(ক) আরোপিত জরিমানা;

(খ) কর্তব্য কাজে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কর্তন;

(গ) কোন শ্রমিকের হেফাজতে প্রদত্ত মালিকের কোন মালামালের ক্ষতি বা লোকসান, অথবা তিনি যে অর্থের জন্য হিসাব দিতে দায়ী, সে অর্থ বিনষ্টের জন্য কর্তন, যদি উক্তরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের জন্য সরাসরি তার অবহেলা বা গাফিলতি দায়ী হয়;

(ঘ) মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসস্থানের জন্য কর্তন;

(ঙ) চাকুরীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত সুযোগ-সুবিধা ও সেবার জন্য কর্তন;

(চ) কোন অগ্রিম বা কর্জ আদায়ের জন্য কর্তন, অথবা কোন অতিরিক্ত মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে তা সমন্বয়ের জন্য কর্তন;

(ছ) শ্রমিক কর্তৃক প্রদেয় আয়কর বাবদ কর্তন;

(জ) কোন আদালতের আদেশে কর্তন, অথবা উক্তরূপ কর্তনের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্তন;

(ঝ) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য হয় এই রকম কোন ভবিষ্য তহবিল অথবা আয়কর আইন, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৬ নং আইন) এ সংগায়িত কোন স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ভবিষ্য তহবিলের জন্য চাঁদা কর্তন অথবা তা থেকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের জন্য কর্তন;

(ঞ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সমবায় সমিতিকে প্রদানের জন্য অথবা বাংলাদেশ ডাকবিভাগ অথবা সরকারী কোন বীমা কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত কোন বীমা স্কীমকে প্রদানের জন্য কর্তন;

(ট) শ্রমিকগণের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যগণের কল্যাণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে মালিক কর্তৃক গঠিত কোন তহবিল অথবা তৎকর্তৃক প্রণীত কোন স্কীমের জন্য শ্রমিকগণের লিখিত সম্মতিতে, চাঁদা কর্তন; এবং

(ঠ) চেক-অফ পদ্ধতিতে সিবিএ ইউনিয়নের জন্য চাঁদা কর্তন।

এছাড়াও ২০০৬ সালের শ্রম আইনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন সংক্রান্ত বিধানও ১৩৮ ধারাতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে নিম্নতম মজুরী বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিধান নিম্নরূপ বলা আছে-

ধারা ১৩৮

সরকার নিম্নতম মজুরী বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করবে।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড, অতঃপর এই অধ্যায়ে মজুরী বোর্ড বলে উল্লিখিত, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথাঃ -

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) একজন নিরপেক্ষ সদস্য;

(গ) মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য; এবং

(ঘ) শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য।

ধারা ১৩৯ এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে, মজুরী বোর্ডে নিম্নলিখিত সদস্যদ্বয়ও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা :

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য;

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য।

মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিরপেক্ষ সদস্য এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হতে নিযুক্ত হবেন যাদের শিল্প শ্রমিক ও দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে, এবং যারা কোন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নন অথবা কোন শ্রমিক বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত নন।

সরকারের মতে, যে সকল প্রতিষ্ঠান মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সে সকল প্রতিষ্ঠানের কোন মনোনয়ন থাকলে তা বিবেচনা করে উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন মালিক এবং শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণকে নিযুক্ত করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি একাধিক প্রচেষ্টায় মালিক কিংবা শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন না পাওয়া যায় তাহলে সরকার, নিজ বিবেচনায়, যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই মালিক কিংবা শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও নিম্নতম মজুরী হার বিষয়ে ১৪৯ ধারাতে কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

ধারা ১৪৯

(১) কোন শ্রমিককে এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের কম হারে কোন মজুরী প্রদান করতে পারবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কোনভাবে কোন শ্রমিকের এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের অধিক হারে মজুরী অথবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা অব্যাহতভাবে পাবার

অধিকার ক্ষুন্ন করবে না, যদি কোন চুক্তি বা রোয়েদাদের অধীন বা অন্য কোন কারণে তিনি উক্তরূপ অধিক হারে মজুরী পাবার অথবা কোন প্রথা অনুযায়ী উক্তরূপ সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী হন। ২০০৬ সালের এই শ্রম আইন এখনও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। অতিসত্বর এই আইন ও পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি শিল্পমজুরীর ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।[৮] এই শিল্পে সাধারণতঃ ১৫ থেকে ২৪ বয়সের শ্রমিকরা কর্মরত এবং তারা গ্রাম থেকে শহর অভিমুখী শ্রমিক। নিয়োজিত শ্রমিকরা যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন তেমনি তাদের কর্মক্ষেত্রে তারা অবিরাম শোষনের শিকার। ফলে দেখা যায় যে, তারা শুধুমাত্র দীর্ঘ সময়ই কাজে নিয়োজিত থাকছেন না, তাদেরকে রাত্রিকালীন সময়েও কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং বাধ্যতামূলকভাবে ওভারটাইম করানো হচ্ছে, সাপ্তাহিক ছুটি থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা সঠিক সময়ে তাদের মজুরী পাচ্ছে না। বিগত সময়ে বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ফলে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ অতি নিম্নমানের এবং বিপজ্জনক।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরী দেশের যে কোন শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় কম। ১৯৮৭ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল মাত্র ২৭০ টাকা। তখন সরকারী খাতের শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল ৪৫০ টাকা। অপর দিকে ১৯৯৪ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল মাত্র ৬০০ টাকা। একই সময়ে সরকারী শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল ৯৫০ টাকা। বর্তমানে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি ১৬৬২ টাকা হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ শ্রমিকরাই তাদের ন্যূনতম মজুরী পাচ্ছে না। এই সামান্য মজুরীও গার্মেন্টস মালিকেরা যথাসময়ে শ্রমিকদের দেয় না। গার্মেন্টস মালিকেরা মাসের পর মাস কাজ করিয়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে ছাঁটাই করে। কোন কোন মালিক দুই-তিন মাস কাজ করানোর পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা দিয়ে আবার দুই তিন মাস পর কারখানা চালু করে। ততদিনে ঐ কারখানার শ্রমিকেরা হয়তো জীবন-জীবিকার তাগিদে অন্য কারখানায় চলে যান। এইভাবে নানা কৌশলে গার্মেন্টস মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চিত করে।

ইসলামে শ্রমিকের মজুরী অধিকার

আল্লাহ তাআলা জীবিকার উপাদান বিশ্বে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। ইসলামে শ্রমিক আর মালিকের কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুসারে এ দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে হবে।[৯] মালিকের কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী নির্ধারণ করে শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। এ কারণেই মহানবী স. শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ শেষ করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ্ স.

শ্রমিকের মজুরী সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[১০]

অপর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন, তারমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে ও তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।[১১] এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, 'শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে নিয়োগ করতে রসূলুল্লাহ্ স. নিষেধ করেছেন।[১২]

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো, ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে পারে। রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন, অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।[১৩] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন ,"শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম।[১৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে এ কথা বোঝা যায় যে, ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। ইসলামের নীতিমালা হল মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব নিবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। কারণ তারা তাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এ পরিশ্রম করে এবং এই মজুরীই তাদের একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব চাপানো যাবে না। তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। এমনিভাবে তাদের বাসস্থানের বিষয়টিও নিশ্চিত করা মালিক বা সরকার পক্ষের কর্তব্য।

ইসলাম মূলত এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবার অধিকারই সংরক্ষিত থাকে এবং চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের[১৫] অধিকার আদায় করে দিতে সকলেই উদ্বুদ্ধ থাকে। এভাবে ইসলাম যেমন একদিকে মালিককে তার কর্মে নিযুক্ত শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে নির্দেশ করেছে অন্যদিকে শ্রমিককেও আপন মালিকের নির্ধারিত কাজে নিজের একনিষ্ঠ শ্রমটুকু নিয়োগ করতে বলেছে।[১৬] দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রমিক কাজে কোনরূপ গাফলতী করতে পারবে না। সৎ কর্মশীল একজন শ্রমিক যে আল্লাহর ও মালিকের হক আদায় করে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়।[১৭] রসূল স. এর পেশকৃত শ্রমনীতিতে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক পারিশ্রমিক বা মজুরী প্রদানের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে যাতে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনাদি সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করা যায়। রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অবশ্যই তোমাদের ভাই, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন।[১৮]

উপসংহার

গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। দেশের স্বার্থে এই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ মজুরী নির্ধারণ জরুরী। ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে শুধু শ্রমিক নয় মালিকপক্ষেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব বহাল থাকলে গার্মেন্টস শিল্পগুলোতে অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করবে। সমাজে একজনের কর্তব্য অন্য জনের অধিকার নিশ্চিত করে। শ্রমিকের যেমন কর্তব্য সঠিক শ্রম প্রদানের মাধ্যমে কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে মালিকের অধিকারকে নিশ্চিত করা। অন্যদিকে মালিকের কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যা শ্রমিকের অধিকার তথা মানবাধিকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও শ্রমিক - এই তিন পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি ও শ্রমনীতির আলোকে শ্রমের যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পকে পূর্ণ সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। তবেই শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়নের স্থিতিশীল পরিবেশে এ শিল্প দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ শুধু মালিক শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্কের উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে না, সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও নিশ্চিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. A news letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April – May, 2006, p. 3.

২. Dr. Pratima Paul-Majumder, '*Social Security Challenges in the Manufacturing Sector : A Gender perspective*' Human Rights in Bangladesh 2004, published by Ain O Salish Kendra (ASK), First Published 2005, Dhaka, p. 174.

৩. নাহিদ ফেরদৌসী, '*গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও বাস্তবতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*' ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা ঃ ১০, এপ্রিল-জুন ২০০৭, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৬৩।

৪. গাজী শামছুর রহমান, '*শ্রম ও শিল্প আইন*' ,আলীপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৪।

৫. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, '*বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ,*' সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ২২০।

৬. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, '*বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ,*' সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ: ২৩২।

৭. তানজিলা রহমান '*বাংলাদেশে শ্রমিক আইন ও নারী শ্রমিকের অধিকার*', দৈনিক সংগ্রাম, ১ মে ২০০৭, পৃঃ ৫।
৮. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, 'ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার' প্রকাশকাল : পঞ্চম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০০৩, পৃঃ ১২।
৯. শামসুল আলম 'ইসলামী রাষ্ট্র' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশকাল ১৯৮৬, পৃঃ ১২৪।
১০. ইবনে মাজা, সূত্রঃ হিদায়া, ৩য় খ , পৃঃ ২৯৩।
১১. বুখারী শরীফ, পৃঃ ২২৬।
১২. বায়হাকী, সূত্রঃ ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১১৭।
১৩. মুসলিম শরীফ, সূত্র ঃ ইসলামে শ্রমিকের অধিকার।
১৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃঃ ২৫১।
১৫. 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃঃ ৫০০।
১৬. ড. সাইদুল্লাহ কারী, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শের আলোকে শ্রম ও শ্রমিক', মাসিক মদীনা সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃঃ ৮৪।
১৭. 'ফাতাওয়া ও মাসাইল ৬ষ্ঠ খণ্ড' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন, ২০০১, পৃঃ ২১৯।
১৮. ডঃ খালিক দাদ, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা' মাসিক মদীনা, মে ২০০৬, পৃঃ ৬৫।

আইন ও বিচার প্রতিবেদন
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '০৮ শীর্ষক সেমিনার

শহীদুল ইসলাম

॥ এক ॥

২৫ মার্চ ২০০৮ রোজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ"-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি': একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুস সুবহান। প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিচারপতি আবদুর রউফ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মাইমুল আহসান খান, বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '০৮ এর পর্যালোচনা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। অতএব মানব সভ্যতাকে অক্ষুণ্ন

রাখতে হলে আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখতে হবে। তিনি বলেন, বৃটিশ শাসকরা আইন করে এ ভূখণ্ডের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে কখনো আঘাত করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। পাশ্চাত্য তথা ইউরোপ-আমেরিকা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত রেখেই আইন করে। ধর্মকে বাদ দিয়ে তারা উন্নতির চেষ্টা করে না। বাংলাদেশের সংবিধান কুরআনী আইনকে সুরক্ষা দিয়েছে। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের আইন করে পাশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছে। এদেশের আইন ও নীতি প্রণয়নে কোন ধরণের দ্বান্দ্বিক বিধান বা নীতি করা যাবে না। সকল পক্ষের কথা শুনে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধান সমুন্নত রেখে নারীনীতি প্রণয়ণ করতে হবে। অবিবেচনা প্রসূত নীতি প্রত্যাহার করে দেশের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন, ধর্মীয় বিধান সবচেয়ে মূল্যবান বিধান। এদেশের সকল মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে চায়। মানুষ সৃষ্টিরসেরা আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের কাজ হওয়া উচিত সকল সৃষ্টির চেয়ে উন্নত। প্রতিটি মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব আমাদের সেই কাজ করা উচিত যাতে প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাসে কোন ধরনের বিচ্যুতি না ঘটে।

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, আজকে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কি কুরআন সুন্নাহ মতো হবে নাকি ভিন্ন কিছু হবে? তিনি সদ্য প্রকাশিত নারী উন্নয়ন নীতির প্রশ্নে আরো বৃহত্তর আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানান।

সভাপতির ভাষণে মাওলানা আবদুস সুবহান বলেন, কারো দ্বারা প্ররোচিত কিংবা বিশেষ মহলকে খুশী করার জন্য বর্তমান সরকার যে নারীনীতি প্রণয়ন করেছে তা প্রত্যাহার করে বিজ্ঞ উলামা ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে কুরআন সুন্নাহকে সমুন্নত রেখে নারীনীতি প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের এসব সংঘাতমূলক কাজ না করে যা দ্বারা সকল মানুষের উপকার হয় এমন কাজ দেশের সকল মানুষ আশা করে। তিনি এ নারীনীতি প্রত্যাহার করে জাতীয় নির্বাচনের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গবেষক ও লেখক সম্মেলন- ২০০৮

॥ দুই ॥

১১ এপ্রিল ২০০৮ শুক্রবার সকাল ৯.৩০ টায় সংস্থার দফতরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া ও কওমী মাদরাসায় অধ্যাপনারত বিশিষ্ট লেখক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে 'আল-মওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ এবং ইসলামী আইন গবেষণা' শীর্ষক লেখক ও গবেষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।। এতে প্রতিষ্ঠানের

সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ২৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক গবেষক অংশগ্রহণ করেন।

সংস্থার গবেষণা সহকারী তারেক মুহাম্মদ জায়েদ-এর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কর্মসূচি শুরু হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, সংস্থার চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুস সুবহান। এরপর চলে পরিচিতি পর্ব। প্রত্যেকেই নিজের পরিচয়
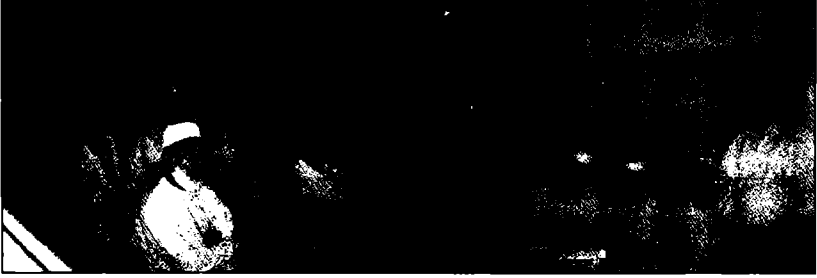
বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. মাইমুল আহসান খান সাবেক চেয়ারম্যান আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তুলে ধরেন। অত:পর স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

- মওসূআ প্রকল্প ও অনুবাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মদ মূসা।
- ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, আইন ও বিচার পত্রিকার সম্পাদক ও রিসার্চ পরিচালক বিশিষ্ট গবেষক চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব।
- ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী।
- তাকলীদ ও মাযহাব সম্পর্কে গবেষকদের করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন প্রফেসর ড. মাইমুল আহসান খান।

অংশগ্রহণকারী গবেষকগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন–

১. ড. হাসান মঈনুদ্দীন বলেন, মওসূআর মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে এমন লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে যাদের ফিকহ সম্পর্কে বুৎপত্তি রয়েছে এবং আরবী বাংলা ইংরেজি এই তিন ভাষায় দক্ষ একটি সম্পাদক পরিষদ গঠন করতে হবে।

২. ড. আবুবকর মুহাম্মদ যাকারিয়া (চেয়ারম্যান আল ফিকহ বিভাগ ই.বি) বলেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল পরিভাষা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। অনুদিত পাণ্ডুলিপির সম্পাদনায় একটি দক্ষ সম্পাদনা বোর্ড থাকতে হবে, যারা এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করবেন।

৩. ড. ওয়ালিউল্লাহ, (ই.বি) বলেন, অনুবাদ শাব্দিক ও হুবহু হওয়া দরকার। পরিভাষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আরবীর সাথে ইংরেজী শব্দও থাকা প্রয়োজন।

৪. উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু ইউসুফ খান, (তা'মিরুল মিল্লাত) বলেন, এ কাজ বিলম্ব না করে নিজেদের উদ্যোগেই শুরু করা দরকার। কঠিন ও পরিভাষাগত শব্দগুলোকে জনসাধারণের বোধগম্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনী সংযোজন করতে হবে। গোটা কাজের জন্য একটি অনুবাদক টিম গঠন করে প্রথম খণ্ড এখনই ভাগাভাগি করে দিয়ে দেয়া দরকার।

৫. জনাব শাহজালাল (আই.আই.ইউ.সি) বলেন, পুরো মওসূআহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে এমন লোকদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। সম্পাদনা বোর্ডে অভিজ্ঞ আইনবিদ রাখতে হবে যারা আইনের পরিভাষাগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করবেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ৮/১০ জনের একটি সার্বক্ষণিক টিম দরকার।

৬. মুফতী আব্দুল মান্নান বলেন, মওসূআহ অনুবাদের ক্ষেত্রে উর্দূ সংস্করণ ফলো করা যেতে পারে এবং প্রতিটি বিষয়কে ভিত্তি করে মৌলিক প্রবন্ধ তৈরি করা যেতে পারে।

৭. প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী ই. বি. বলেন,
   ক. এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
   খ. অনুবাদ অনুবাদকদের নামে ছাপতে হবে।
   গ. খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
   ঘ. বড় নিবন্ধগুলো দু'জনকে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে। সেই সাথে অনুবাদকগণ যাতে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারেন এমন পরিচিত ও কাছাকাছি অবস্থানকারীদের মধ্যে কাজ বণ্টন করা দরকার। তাহলে কাজের মান ভাল হবে।
   ঙ. এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ সংগ্রহের জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নেয়া দরকার।

৮. আতাউর রহমান নদভী বলেন, (IIUC) এই উদ্যোগের সামনে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। হাল ছেড়ে না দিয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আরবী পরিভাষাগুলো আরবীতে রেখে সবচেয়ে কাছাকাছি বাংলা হরফে প্রতিবর্ণায়ন কিংবা বাংলায় রূপান্তর করতে হবে। যাতে উচ্চারণ বিভ্রাট থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা যায়। অনুবাদের ক্ষেত্রে উর্দূ ও ইংরেজি অনুবাদের স্টাইল সামনে রাখা যেতে পারে।

৯. প্রফেসর ড. মাইমুল আহসান খান বলেন, ইসলামকে আমাদের সমাজের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। গবেষকদেরকে সকল ধরনের গোষ্ঠীগত ফেরকার উর্ধে উঠে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে সামষ্টিকভাবে সমন্বিত কাজ করতে হবে। তাহলে আমাদের পক্ষে যে কোন বড় কাজ সমাধা করা সম্ভব হবে।

সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা

॥ তিন ॥

বিগত ২৫শে এপ্রিল ২০০৮ তারিখে বিকেল ৪.০০ টায় রিসার্চ মিলনায়তনে বিশ্বখ্যাত মিশরীয় শিক্ষাবিদ সাইয়েদ আসসাইয়েদ আসসাফতীর বক্তৃতা ও তাঁকে সম্মাননা জানানোর উদ্দেশ্যে একটি আলোচন ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিশজন বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশে'র জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষাবিদ খ্যাতনামা আরব চিন্তাবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইয়েদ আসসাইয়েদ আসসাফতী। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ বাংলাদেশে দীনি শিক্ষা প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব রিলিজিয়াস সাইন্সেস-এর ডীন হিসেবে কর্মরত আছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব সাফতী 'বর্তমানে ইসলামী ফিকহের অগ্রাধিকার হিসেবে করণীয়' (Preferences of Islamic Fiqh in the Modern Time) সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইয়েদ আসসাইয়েদ আসসাফতী

জনাব সাফতী ইতিহাস থেকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, প্রথম চার খলীফা মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছিলেন যা যুগোপযোগী ও কল্যাণকর ছিল। তাদেরকে অনুসরণ করে আমাদেরকেও বর্তমান যুগের সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা করতে হবে ও সমাধান উদ্ভাবন করতে হবে। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে মাকাসিদ-আশ-শারিয়াহ্ এর সাথে সেগুলো সংগতিপূর্ণ কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইয়েদ আসসাইয়েদ আসসাফতী সাহেবকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুস সুবহান ও সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি এড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালেক, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, ইমাম শাতবী রহ. প্রমুখ ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছ ও সিদ্ধান্তকে গতিশীল করার ব্যাপারে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, তালাকের ফিকহী মাসআলার ভুল প্রয়োগের কারণে বাংলাদেশে অনেক পারিবারিক বিচ্ছেদ ঘটে যা অনাকাঙ্খিত। তিনি ইসলামী অর্থনীতি, যাকাত ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সবশেষে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

অতপর 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুস সুবহান সভাপতির বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যের পূর্বে বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আস-সাফতী-এর গঠনমূলক কর্মকাণ্ড ও দীনের প্রচার প্রসারে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে তাঁর হাতে একটি সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : April-June 2008, TK : 35